খাদ্যশস্য

আলুর চাষ, কলার চাষ, তুলার চাষ,
ইক্ষু চাষ, বেনেতিবাগ, পান চাষ
প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা—

ডাঃ শ্রীযামিণী রঞ্জন মজুমদার
এম, এস-সি, ; পি, এইচ ডি; ডি, এগ্রি (টোকিও)

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক —

মিঃ বি, ছত্তার বি, এ

জেঃ ম্যানেজার—ফেডারেশান ব্যাঙ্ক
অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৫১

মুদ্রাকর—শ্রীজলদারমণ ভট্টাচার্য্য
বেঙ্গল প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি
৪২নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

সূচীপত্র

খাদ্যশস্য

খাদ্যশস্য—ধান্য, গম, যব, ভুট্টা, মুগ, মসুর ইত্যাদি

ধান্য (Oryza Sativa)

ধান্য উৎপত্তির ইতিহাস (Origin of rice)—ধান যে কোন্ সময়ে এবং কোথায় প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। উদ্ভিদ্‌বিদ্‌দিগের মতে ইহার প্রথম উৎপত্তি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায়। ভারতবর্ষ, মালয় প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বহু পূর্ব্বে চীনদেশের ইতিহাসে ধানের কথা লেখা আছে। কিন্তু চীনেই যে প্রথম ধান জন্মিয়াছিল তাহারও প্রমান পাওয়া যায় না। ভারতে, উত্তর-পশ্চিমাংশ বাদে সর্ব্বত্র চাউলই প্রধান খাদ্য। ধান হইতে চাউল প্রস্তুত হয়। সকল দেশে সমানভাবে ধান জন্মে না। ইহা স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। জমিতে ও বায়ুমণ্ডলে প্রচুর জল থাকিলেই এই ফসল ভালরূপ জন্মিতে পারে। এই জন্যই বাংলা, আসাম ও ব্রহ্মদেশে প্রচুর ধান জন্মে।

পৃথিবীর উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান খাদ্যশস্য ধান। ইণ্টারন্যাশন্যাল এগ্রিকালচার ইন্‌ষ্টিটিউট (Internotional Agriculture Institute) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে পৃথিবীর প্রতি বৎসরের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ তিনশত মিলিয়ান পাউণ্ডেরও অধিক। মানুষের

খাদ্য মধ্যে আর কোন শস্য এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা হয় না।

ধানগাছ ও রবিশস্য—ধান একপ্রকার ঘাস। ইহাকে রবিশস্য বলা হয়। যে সকল শস্য সূর্য্যের উত্তাপে পরিপক্ক হয় এবং একবার মাত্র ফল হইলেই সেই সকল গাছ শুকাইয়া যায় এবং সেইগুলিতে আর ফল ধরে না তাহাদিগকেই রবিশস্য বলে। রবিশস্যই আমাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। ধান, বিবিধ ডাল, তিল, তিসি, সরিষা প্রভৃতি সমস্তই রবিশস্য।

স্বভাবজাত ও আবাদজাত ধান (Natural and Cultivated paddy)—সাধারণতঃ ধান দুইপ্রকার, যথা :—স্বভাবজাত ও আবাদজাত। স্বভাবজাত ধানকেই উড়ি বা ঝরা বলে। এই জাতীয় ধান খুব ভালভাবে পাকিবার পূর্ব্বেই ঝরিয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও আসামের বড় বড় বিলের মধ্যে এই জাতীয় ধান জন্মিতে দেখা যায়। আবাদ ও চেষ্টার ফলে আবাদজাত ধানের সহজেই ঝরিয়া পড়ার দোষ নিবারিত হইতে পারে।

ধানের আবাদ (Cultivation of rice)—ধান দুইভাবে জন্মান হয়, যথা—বপন ও রোপণ। জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া যথোপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইলে তাহার উপর বীজধান ছড়াইয়া দেওয়া হয়। প্রচুর জল ও উপযুক্তরূপে তাপ ও বাতাস পাইয়া এই সকল বীজধানের অঙ্কুরোদ্গম হয়। ইহাকেই বপন বলে। দ্বিতীয় প্রকারকে রোপণ বলে। ইহার একটু

বিশেষত্ব আছে। প্রথম একটু ছোট জায়গায় বীজ বুনিতে হয়। সেই জমিতেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়, এবং অঙ্কুরগুলি ক্রমে ক্রমে চারায় পরিণত হয়। প্রচুর বৃষ্টির ফলে যখন ক্ষেতে জল দাঁড়াইয়া যায়, তখন সেই জমি হইতে চারাগুলি তুলিয়া অপর জমিতে রোপণ করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেতের চারিদিকের আল বাঁধিয়া জল ধরিয়া রাখিতে হয়, নতুবা শীঘ্রই ধানের চারাগুলি শুকাইয়া যায়। বৃষ্টির অভাব হইলে খাল, বিল, কূপ কিংবা পুকুর হইতে জল সেচন করিয়া জমিকে জলপূর্ণ করিয়া রাখা দরকার ; নচেৎ জলাভাবে ধানগাছ বাড়িতে পারে না ; গাছ বাড়িলেও ফল ধরিবে না। ধানগাছের মূল খুব ছোট গুচ্ছাকার। শক্ত এঁটেল মাটির উপর কিছু পলি পড়িলে ধানের আবাদ খুব ভাল হয়।

ধান গাছের গঠন (Structure of paddy)—ধানগাছের প্রধান মূল (Tap root) অল্পকাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায় ও অস্থানিক মূল (Adventitious root) গুচ্ছাকারে গোড়া হইতে বাহির হয়। ইহার কাণ্ডের পাব ফাঁপা। পাবের সন্ধি বা গাঁইট হইতে পাতা বাহির হয়। পাতা দীর্ঘ ও সূচ্যাগ্র। পাতার শেষভাগ কাণ্ডকে জড়াইয়া থাকে। কাণ্ডের শীর্ষদেশে বা চূড়ায় ফুল ও ফল ধরে। এই অংশকে শীষ বলে। সাধারণ ফুলের ন্যায় ইহাদের বৃতি ও দল বিকশিত হয় না। কয়েকটি পৌষ্পিক পত্র (Bract) পুষ্পমুকুলটিকে ঢাকিয়া রাখে। পরে যখন ফুল হইতে বীজ হয় তখনও ইহারাই বীজটিকে রক্ষা

করে। ‘ধানের ফুলের দুইটি অতি ক্ষুদ্র ও দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় পৌষ্পিক পত্র থাকে। তৃতীয় পৌষ্পিক পত্রের কোলে ফুলটি থাকে। চতুর্থ পৌষ্পিক পত্রকে পালিয়া বলে। বাকি তিনটিকে গ্লুম (Glum) বলে। ধান জাতীয় গাছের ফুলের বৃতি ও দল রূপান্তরিত হইয়া দুইটি অতি ছোট লডিকিউল (Lodicule) গঠন করে। চতুর্থ পৌষ্পিক পত্র পালিয়ার ঠিক উপরেই লডিকিউল দুইটি থাকে। ইহারা এত ছোট যে চোখে দেখা যায় না। লডিকিউলের উপরে দুইটি আবর্ত্ত (Whorl)। প্রত্যেক আবর্ত্তে তিনটি করিয়া পুংকেশর থাকে। পুংকেশরের ঠিক উপরেই আর একটি আবর্ত্তের গর্ভকেশরের স্থান। চাউল উৎপন্ন হইবার পর ফুলের পুংকেশর ও লডিকিউল দুইটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে।

ভারতের ধানজমির পরিমাণ—ভারতবর্ষে প্রায় সত্তর পঁচাত্তর লক্ষ একর জমিতে ধান জন্মে। ইহার মধ্যে বাংলা বিহার ও আসামে চল্লিশ লক্ষ একর এবং ব্রহ্মদেশে নয় দশলক্ষ একর। কিন্তু ইহার বেশীর ভাগই বিদেশে রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজে আট হইতে নয় লক্ষ। মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে সাড়ে চার লক্ষ। যুক্তপ্রদেশে সাড়ে ছয় লক্ষ। বোম্বাই বা সিন্ধুপ্রদেশে দুই বা আড়াই লক্ষ। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে মাত্র পঁচাত্তর হাজার একর।

বাংলাদেশে ধানের সাধারণ শ্রেণীবিভাগ—এক বাংলা দেশেই বহুপ্রকার ধান পাওয়া যায়। ধান মোটামুটি তিন প্রকার,

—(১) আউস বা আশুধান্য (২) আমনধান্য ও (৩) বোরো। প্রত্যেক জাতীয় ধান্যের মধ্যে আবার বহু রকম ধান আছে।

(১) আউস ধান—বৈশাখ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা হয়। সাধারণতঃ এই জাতীয় ধান বপন হইতে তিন মাসের মধ্যে পাকে। জমির ও দেশের অবস্থাভেদে কখন কখনও ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত আউস ধান বপন করা হয়। আউস ধানের চাউল কিছু মোটা ও দুষ্পাচ্য। ইহা সাধারণতঃ উঁচু জমি এবং বেলে মাটিতে জন্মে। ইহার জন্য আমন অথবা বোরো অপেক্ষা কম জলের প্রয়োজন হয়।

(২) আমন ধান—অগ্রহায়ণ বা পৌষে পাকে। আমন ধান সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) বড়ান, (২) ছোটনা। বড়ান পূর্ব্ববঙ্গেই বেশীর ভাগ জন্মায়। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষাকালে জমিতে প্রচুর জল জমে, তথায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার গাছ না জন্মিলে, ঐ গাছ জলে ডুবিয়া যায়। এই দীর্ঘাকার আমনই বড়ান। এই গাছের বৃদ্ধি এত বেশী যে প্রত্যেক দিন জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছও বাড়িতে থাকে এবং গাছের একটুখানি জলের উপরে থাকিলেই তাহা জীবিত থাকে। খুলনা, যশোহর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানই বড়ান ধানের আবাদ দেখা যায়। যে সকল জমির উপর বেশী জল জমে না, সেখানে ছোটনা আমনের আবাদ হয়। এই ধানই ক্ষুদ্রাকার ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহার চাউল খুব সাদা।

মিহি ভাল চাউল প্রায়ই আমন ধানের, কোন কোন চাউলে

খুব সুন্দর গন্ধ থাকে ; যেমন গোবিন্দভোগ, বাঁশমতি, বেনেফুলি কামিনী, বাদসাভোগ, পায়সান্নশাল, রাঁধুনীপাগল, প্রভৃতি। হরিণামুণি, বাকচুর ও নলকোষ ধানে খুব ভাল খই হয়।

যে সকল আমন ধান উঁচু জমিতে ভাল ও মিহি জন্মায়, জলা জমিতে তাহাদের আবাদ করিলে ধান মোটা ও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। বাখরগঞ্জের আমন ধান মোটা ও মিহি দুই প্রকারই জন্মে। বাখরগঞ্জের চাউল অন্যস্থানের আমন হইতে ভিন্ন প্রকার। ইহাকে বালাম চাউল বলে।

(৩) **বোরোধান**—খুব কমই আবাদ করা হয়। ইহা বৎসরে দুইবার জন্মে। (১) ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে রোপণ করিয়া বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে কাটা হয়। (২) ভাদ্র মাসে রোপণ করিয়া কার্ত্তিক মাসে কাটা হয়। বোরোধান অতিশয় মোটা ও ইহার চাউল বড়ই দুষ্পাচ্য।

চাউল—ধান হইতে চাউল পৃথক্ করিবার জন্য সাধারণতঃ দুই প্রকার প্রথা আছে। ধানকে রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া চাউল বাহির করা হয়। ইহাকে 'আতপ শুষ্ক' বা 'আতপ' কহে। ব্রহ্মদেশে আতপ চাউলই বেশী। আমাদের বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিধবারা এই চালের ব্যবহার করেন।

সাধারণতঃ ধান জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়, পরে ঢেঁকিতে কুটিয়া চাউল বাহির করিতে হয়। ঢেঁকিতে ধান কুটাকে "ধান ভানা" কহে। আজকাল কলের সাহায্যে সহজে ধান সিদ্ধ ও ভানার ব্যবস্থা হইয়াছে।

চিড়া, খই ও মুড়ি—ধান সিদ্ধ করিয়া উত্তপ্ত খোলায় কিছুক্ষণ নাড়িয়া সজোরে ঢেঁকিতে কুটিলে ধানের ভিতরকার নরম চাউল চেপ্টা আকারে পরিণত হয় ও তাহাকে চিড়া কহে! কোন কোন ধান গরম খোলায় ভাজিলেই ফুটিয়া খই প্রস্তুত হয়। কোন কোন সুসিদ্ধ চাউল বালির খোলায় ভাজিলে মুড়ি প্রস্তুত হয়।

চাউল হইতে খাদ্য ও অন্যান্য উপকার—চাউল জলে সিদ্ধ করিলে ভাত, দুধে সিদ্ধ করিলে পায়স হয়। তাহা ছাড়া চাউল ভাঙ্গিয়া যে সবেদা হয়, তাহা হইতে রুটি, পিঠা ইত্যাদি উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হয়। চাউলের মণ্ড বা মাড় দিয়া কাপড়ের কলে কাপড় পালিস করা হয়। ধান হইতে মদ চোলাই হয়। ধানের খড়ও গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতিকে খাইতে দেওয়া হয়। কোন কোন খড় দ্বারা পল্লীগ্রামে ঘরের চাল ছাওয়া হয়।

চাউল ও বেরিবেরি নামক ব্যাধি—বৈজ্ঞানিকেরা বলেন চাউলের উপরিস্থিত লালি আবরণই চাউলের সার ভাগ। উহা ছাড়াইবার জন্য অনেক সময় চূণ দিয়া চাউলকে মাজা বা পরিষ্কৃত করা হয়। কলেও ঐ প্রকার পরিষ্কার হইতে পারে এবং ঐরূপ পরিষ্কৃত চাউলকে 'কলছাটা' চাউল বলে। উভয় প্রকার চাউলের ভাত খাইলে "বেরিবেরি" নামক ভীষণ ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে।

ধান্য

ধান্যই নিম্নপ্রদেশগুলির প্রধান খাদ্যশস্য এবং সকলের চাইতে ইহার বেশী আবাদ হয়। প্রদেশগুলির মোট জমির পরিমাণ ৫৭,২৫৩,২০০ একর বা ১৭১,৭৫৯,৬০০ বিঘা; তন্মধ্যে ৩৯,৮৯৩,০০০ একর বা ১১৯,৬৭৯,০০০ বিঘা জমিতেই ধান্য উৎপাদিত হয়। প্রদেশগুলিতে নিম্নলিখিত প্রকারে ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায়ঃ—

	আবাদি জমির মোট আয়তন।	ধান্য উৎপাদনের ভূমির আয়তন।
নিম্নপ্রদেশ	২৬,৯৮৮,১০০	২০, ৭০৭,২০০
বিহার	১৮, ৮৮২,৮০০	১১,১২৪,৩০০
উড়িষ্যা	৩,৫৭০,৬০০	২,৫৯২,৯০০
ছোটনাগপুর	৮,৩১০, ৭০০	৫,৪৬৮,৬০০
মোট	৫৭,২৫৩,২০০	৩৯,৮৯৩,০০০

নিম্নলিখিত জেলাগুলি ধান্যোৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেঃ—**নিম্ন**প্রদেশে বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী এবং বর্দ্ধমান। বিহার, গয়া, সাহাবাদ, ভাগলপুর এবং পূর্ণিয়া; উড়িষ্যা ও কটক; ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, রাঁচি এবং মানভূম।

আশুধান্য—আশু ধান্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বদা জল থাকা

আবশ্যক। অন্ততঃ অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত জল না থাকিলে ফসল ভাল হইবে না। চারাগুলি রোপণ করিবার সময় দুই বা তিনটি করিয়া রোপণ করিতে হয়। পরস্পরের ব্যবধান অর্দ্ধ হস্ত হইলেই যথেষ্ট। আশু ও আমন ধান্যের মধ্যে আশু ধান্য শীঘ্র পাকিয়া থাকে ; সেইজন্যই ইহার নাম আশু।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই জাতীয় ধান্যের চারা রোপণ করিয়া শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে ফসল পাওয়া যায়। চারি মাসের মধ্যেই ধান্য পাকিয়া উঠে। প্রতি বিঘা জমি হইতে ছোটনা ধান্য প্রায় আট মণ পাওয়া যায়, কিন্তু বড়না ও সরু চারি মণের অধিক নহে। ছোটনা হইতে অধিক খড়ও পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ছোটনায় খড় প্রায় বার মণ, কিন্তু অপর জাতীয় আশু ধান্যেব সাত মণের অধিক খড় পাওয়া যায় না।

(১) আশু অথবা শারদীয় ধান্যকে নিম্নবঙ্গে 'আউশ' বিহারে 'ভাদই,' উড়িষ্যায় 'বিয়ালি' এবং ছোটনাগপুরে 'গৌরা' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

আবাদ জমির আয়তন—নিম্নবঙ্গে সমগ্র জেলাতেই কম বেশী আউশ ধান্যের চাষ হইয়া থাকে এবং বিহারেও খুব অল্প পরিমাণে হয়। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের বিবরণী অনুযায়ী এই প্রদেশে চলিত আউশ ধান্যের মোট আবাদ জমির পরিমাণ মোটামুটি ৭,৮৭৩,৪০০ একর অথবা ২৩,৬২০,২০০ বিঘার মত।

	মোট আবাদী জমি	মোট আশুধান্যের জমি
বাংলা	২৬,৯৮৯,১০০	৪,৫৪৫,২০০
বিহার	১৮,৮৮২,৮০০	১,৬৫৭,৩০০
উড়িষ্যা	৩,০৭০,৬০০	৩৫০,৩০০
ছোটনাগপুর	৮,৩১০,৭০০	১,৩১০,৬০০
মোট	৫৭,২৫৬,২০০	৭,৮৭৩,৪০০

বাংলার উত্তর এবং পূর্ব্বভাগের জেলাগুলিতে এবং মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, খালদহ, কটক, রাঁচি এবং মানভূমেই ইহার আবাদ বেশী পরিমাণে হয়। অধিকাংশ স্থলে, পূর্ব্ব বৎসরের আমনধান্য যখন ফুরাইয়া আসে তখন রায়তেরা আপন প্রয়োজনার্থে ইহার চাষ করে।

রকম—স্থানীয় বৈষম্যহেতু আউশধান্য অনেক প্রকারের হয়। নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে আউশধান্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কৃষিবিভাগ সম্প্রতি নাগপুর হইতে একপ্রকার চমৎকার আউশধান্য আমদানী করিয়াছেন। ইহার ফলনই শুধু বেশী নহে পরন্তু দ্বিতীয়বারও একই গাছ হইতে ফসল পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা—কেবল যে সব জমি বসন্ত ঋতুতে উপযুক্ত কর্ষণের অভাবে স্যাঁৎসেঁতে রহিয়া যায়, তাহা বাদে আউশধান্য সকল প্রকার মাটিতে জন্মিয়া থাকে। শক্ত মাটিতে ইহা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। শিথিল মাটি ইহার পক্ষে উপযোগী বলিয়া লঘু মৃত্তিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কর্দ্দমাক্ত অবস্থাও ইহার মূল প্রসারণের বাধা জন্মায়।

আশুধান্যের শ্রেণী

ঢাকা নং ২—**কটকতারা**। ইহা মাঝারি রকমের মিহি ধান। সাধারণতঃ ইহা ৪ মাসে পাকে। ইহা উঁচু জমিতে ছিটাইয়া বোনা হয়। ইহা উঁচু উর্ব্বর জমিতে কোন রবিশস্যের সহিত পাল্টাপাল্টি ভাবে ভাল হয়। মধুপুরের জঙ্গল অঞ্চলের উঁচু জমিতে ইহার ফলন ভাল হয়। ইহা দেরীতে পাকে বলিয়া দো-ফসলি ধান জমির উপযোগী নহে। তবে শীঘ্র পাকে এমন কোন শাইল ধান ইহার সহিত লাগান যাইতে পারে।

ঢাকা নং ৪—**সূর্য্যমুখী**। সকল রকমেই উহা কটকতারার মত।

ঢাকা নং ৩—**চারণক**। ইহা উঁচু ও হালকা জমির উপযোগী আশুধান্য। চারণক খুব চিক্কণ এবং কটকতারা ও সূর্য্যমুখী ধানের চেয়ে আগে পাকে। ফলন ও চাউলের চিক্কণতা হিসাবে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ধান।

ঢাকা নং ৪—**ধারিয়াল**। ইহা এক প্রকার মোটা আশুধান্য। ১১নং ধানের মত ইহা আগে পাকে। ১১ নং ও ১২ নং ধানের জমিও ইহার উপযোগী। ইহার ফলন খুব বেশী; এই কারণে চাষীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য ইহা পছন্দ করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের যে যে অঞ্চলে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই অতি উৎকৃষ্ট ফলন দিয়াছে।

ঢাকা নং ১৬—**কুমারী**। ইহা মাঝারি গোছের মিহি ধান। ১১নং ও ১২নং ধানের জমিই ইহার উপযোগী।

ঢাকা নং ১৮—ইহা শঙ্কর জাতীয় আউশ ধান ও পি×এস্ (৮) নামে পরিচিত। ইহা আগে পাকে। উঁচু, উর্ব্বর অথচ হাল্‌কা ও দো-ফসলি ধান-জমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

বাঁকুড়া নং ২—**ঝাঁজি** (৩৩৪)। বাঁকুড়ার অবিমিশ্র আশু-রোয়া ধান হইতে ইহা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহা মোটা ও প্রচুর পরিমাণে ফলে। উঁচু রোয়া-ধানের জমিই ইহার আবাদের উপযোগী।

বাঁকুড়া নং ৪—**ভুতমুড়ি** (৩৬)। বাঁকুড়ার ভূতমুড়ি আউশ ধানের ইহা একটি উন্নত জাত। ইহা উঁচু জমির উপযোগী ধান। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা অনাবৃষ্টিও সহ্য করিতে পারে। খুব মোটা চাউল বলিয়া চাষী ও শ্রমজীবীরা ইহা খুব পছন্দ করিয়া থাকে

কোন জেলায় কত পরিমাণে আউশ জন্মে

জেলার নাম	সাধারণতঃ কত একর জমিতে ধান জন্মে	গত বৎসর কত একর জমিতে ধান জন্মিয়াছিল	বর্ত্তমান বৎসর কত একর জমিতে ধান জন্মিয়াছে	১৬ আনার মধ্যে কত ধান জন্মিয়াছে	
				গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
২৪ পরগণা	৬৫,৩০০	৪৭,৪০০	৪২৬০০	৬৭	৬৭
নদীয়া	৪৯১,১০০	৪৭০,১০০	৪৬২,২০০	৫৮	৮৩
মুর্শিদাবাদ	২২৯,০০০	১৬৭,৩০০	৯২১,৪০০	৫০	৫০
যশোহর	৩৬৬,৪০০	৩২৯,০০০	৩৫২,০০০	৬৭	৬৭
খুলনা	১৯,০০০	১৯,১০০	৩০,০০০	৯২	৯২
বর্দ্ধমান	১১৮,৮০০	৮০,২০০	৭৩,২০০	১০০	৯২
বীরভূম	১৪৪,২০০	১১১,০০০	১১০,৪০০	৯২	৬৭
বাঁকুড়া	১৩,৮০০	৯,৬০০	৪,৫০০	১০০	৮৩

মেদিনীপুর	২৬৫,৪০০	১[illegible]৫,০০০	১৭৪,০০০	১০০	৮৩
হুগলী	৪৪,৭০০	২৩,১০০	২৪,৬০০	৮৩	৮৩
হাওড়া	৮,৯০০	৮,৫০০	৬,৭০০	৫০	৫০
রাজসাহী	১৬৮,১০০	১৬৬,৪০০	১৫০,২০০	৮৩	৭৫
দিনাজপুর	১৩১,৫০০	১৫৩,৭০০	১৪৮,৮০০	৭৪	৭৬
জলপাইগুড়ি	১৬৫,৭০০	১৪৬,৩০০	১৪০,৮০০	১০০	৬৭
দার্জ্জিলিং	৩,৮০০	৩,৭০০	৩,৭০০	৮৩	৮৩
রংপুর	৩১২,৩০০	৩০১,২০০	২০০,২০০	৯০	৮০
বগুড়া	১১০,৯০০	১৪০,০০০	১০০,০০০	৯০	৫২
পাবনা	২৩০,৩০০	১৯০,৫০০	২৫৩,৩০০	৫৮	৫৮
মালদহ	২৭১,৯০০	১৭০,০০০	১৮০,০০০	৪০	৬০
ঢাকা	২৩৮,৭০০	২৭৬,৫০০	২৭৫,০০০	৭৮	৯২
ময়মনসিংহ	৩৯০,৬০০	৭১৭,২০০	৬৮০,০০০	৮৫	৮০
ফরিদপুর	২৩৯,৩০০	২৩৬,৫০০	২২৬,৫০০	৭৫	৬৮
বাখরগঞ্জ	৩১০,০০০	২৫০,০০০	২৪৫,০০০	৭৫	১০০
চট্টগ্রাম	২০৩,৪০০	১৯৪,৬০০	১৯৪,৬০০	১০০	৮৩
ত্রিপুরা	৩১২,৮০০	৩০৫,৩০০	৩০২,০০০	১০০	৮৩
নোয়াখালী	২০৪,০০০	৩০০,০০০	২৯৯,০০০	৮৩	৮৩
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১৫০,০০০	১৬৮,০০০	১৬২,০০০	১০৮	৬৭
সমস্ত বাংলাদেশ	৫,২১৯,৯০০	৫,১৬০,২০০	৪,৯৬৩,৯৯	৭৮	৭৭

আমন ধান

আবাদী জমির আয়তন—বাংলাদেশে ইহার আবাদ যথেষ্ট পরিমাণে হয় এবং নিম্নবঙ্গে খাদ্যশস্য ইহা হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে। হৈমন্তিক ধান্যের মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৩১,৫৩৬০০ একর বা ৯৪,৬০৮,০০০ বিঘা এবং নিম্নলিখিত প্রকারে ইহার বিস্তার হইয়া থাকে।

	মোট আবাদী জমির পরিমাণ
বঙ্গদেশ	২৬,৯৮৯,১০০
বিহার	১৮,৮৮২,০০০
উড়িষ্যা	৩,০৭০,৬০০
ছোটনাগপুর	৮,৩১০,৭৯৫
	৫৭,২৫৩,২০০

	মোট হৈমন্তিক ধান্যের আবাদী জমির পরিমাণ
বঙ্গদেশ	১৫,৭৫১,৯০০
বিহার	৯,৪৫১,৬০০
উড়িষ্যা	১৮৭,৮০০
ছোটনাগপুর	২৪,১৪৪,৭০০
	৩১,৫৩৬,০০

উত্তর এবং পূর্ব্ব বাংলায় বিশেষতঃ দিনাজপুর, ময়মনসিংহ এবং বাখরগঞ্জ অঞ্চলে ইহার প্রচুর আবাদ হয়। বর্দ্ধমান, গয়া, দ্বারভাঙ্গা, সাহাবাদ, ভাগলপুর, কটক, হাজারিবাগ এবং রাচিতেও যথেষ্ট পরিমাণে ইহার চাষ হয়।

রকম—নিম্ন অঞ্চল সমূহে আমন ধান্যের অনেক শ্রেণী আছে। বর্দ্ধমান বিভাগের মিঃ এ-সি-সেন মহাশয় তাহার বিবরণীতে বলিয়াছেন যে, একমাত্র সেই বিভাগেই এক হাজারেরও অধিক রকমের আমন ধান্য পাওয়া যায়। ত্রিপুরাতে প্রায় দুইশত রকম পাওয়া গিয়াছে। উত্তর এবং পূর্ব্ববাংলার বিখ্যাত ধান্যোৎপাদনের অঞ্চলগুলিতে হাজার রকমের খবর পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত প্রকারের নমুনা এবং তাহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ বাস্তবিকই একটি

ঔৎসুক্যের ব্যাপার। যদি প্রত্যেক জেলাতেই ইহাদের আবাদের চেষ্টা চলে, তাহা হইলে ইহাদের আপেক্ষিক সম্বন্ধও বেশ বোঝা যাইবে। বৰ্দ্ধমান বিভাগে ছয়টি প্রধান পৃথক বীজ লইয়া দেখা যায় বাঁশমতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

বিহারে ডুমরাও পরীক্ষাক্ষেত্রে চারি প্রকার ধান্যের মধ্যে বাঁশমতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে।

রকমের নাম	১৯০০-১৯০২		১৯০৪-৬		১৯০০-১৯০৬	
	শস্য	খড়	শস্য	খড়	শস্য	খড়
বাঁশবাতি	২	৩	৪	৫	৬	৭
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
দয়াদুন (সরু)	৫৫৫	৩,১৫৫	হয় নাই	...	১,০০০	জানা
ানীয় বাঁশমতী (সরু)	২,০৫৫	৩,৩৩৫	১৯,৪৫	৩,৭৮০	১,৪২৫	যায়
ায়মণ্ড হারবার (সরু)	১,৮১৫	২,৬০৫	১,৮৩০	৩,৫৮৫	১,৪০০	নাই
ানীয় বাতাসফেনী (মোটা)	১,৯২৫	২,৯৪৫	১,৯০৫	৩,৬৯৫	১,৪১০	

মৃত্তিকা—হৈমন্তিক ধান্যের পক্ষে জলীয় কৰ্দ্দমাক্ত মৃত্তিকাই সর্ব্বাধিক প্রযোজ্য। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইতেছে এই যে,

জমিটা এমন নীচুতে হইবে, যেন উহাতে জল দাঁড়াইতে পারে এবং কমবেশী মাটীটা কাদাটে হয়।

সার—অধিকাংশ স্থলেই হৈমন্তিক ধান্যের জন্য কোন সারেরই ব্যবহার হয় না। দুই এক জায়গায় যথাসাধ্য সংগৃহীত গোবর দিয়াই সারের কাজ করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, হাড়যুক্ত এবং লবণাক্ত মাটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে:—

প্রতি একরের ফলন

				১৯১৬—১৮		১৯১৮—২০		১৯২০—২২	
				শস্য	খড়	শস্য	খড়	শস্য	খা
	মণ	সের	ছঃ	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউ
গোবর	১০০	০	০	৪,০১১	৪,৮৮৬	৩,৭০৩	৪,৬৯০	৩,৬৪১	৪,৩
সার বিহীন	...		...	১,৫৭৪	২,৬১০	১,২৩৪	১,৬৪২	১,৩৪৩	১,৭
রেড়ীর খইল	৬	০	০	৩,৭৭৮	৪,৮৩৩	৩,৪৩৭	৪,৫৫৭	৩,৩৩৪	৪,১
গোবর	৫০	০	০	৩,৭৬৩	৪,৭৫১	৩,৬৭১	৪,৬৯০	৪,৪৪৩	৫,৬
সার বিহীন	...		...	১,৭৯৯	২,৬৬২	১,২৫৪	১,৬৬৬	১,৬৪৬	৩,২
হাড় চূর্ণ	৩	০	০	৩,৮৩৮	৪,৭২২	৩,৭০১	৪,৯৩৭	৪,৫২১	৬,২
ঐ	৬	০	০	৩,৯১৪	৪ ৭৫৮	৩,৮২৬	৪,৯৩৭	৩,৭০৩	৫,৮
সার বিহীন	...		...	১,৮৯২	২,৭৫৮	১,৪৮১	২,৪৬৯	১,৭৮৬	২,৩
হাড় চূর্ণ সল্ট পিটার	৩ ০	০ ৩০	০ ০	৪,৬২৯	৫,৫৫৪	৪,৫৬০	৫,০৯২	৪,৬৯৮	৬,৩

ছড়ান আমন ধান্য—বাংলার অনেক জেলায় ছড়াইয়া বীজ বপন করাই প্রচলিত। যেখানে পরিশ্রম লাঘব করিবার চেষ্টা হয় সেখানেই এই প্রণালী গৃহীত হয় এবং মোটা রকম শস্যের ব্যবহার এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

নিম্নবঙ্গে এবং বিহারে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী শস্য তুলিয়া লওয়া হইলে, মাঘ মাসে একবার কি দুইবার জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয় এবং আলো ও বাতাসে স্বাভাবিক কার্য্যের জন্য বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখা হয়। তাহার পরেই আর একবার লাঙ্গল দিয়া প্রতি একর জমিতে ৩০ হইতে ৩৬ সের পর্য্যন্ত বীজ বপন করা হয় এবং পুনরায় তাহাতে আর একবার লাঙ্গল দেওয়া হয়। তাহার পর মই দিয়া জমি সমান করিয়া দেওয়া হয়। ক্ষেত হইতে একবার কি দুইবার আগাছা তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং প্রয়োজন মত চারাগুলির সন্নিবেশ পাত্‌লা করিয়া দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও চারাগুলি ৮ ইঞ্চি পরিমাণে বড় হইলে ছোট আকারের লাঙ্গল দিয়া জমিটাকে একবার চষিয়া মই দিয়া সমান করিয়া দিতে হয় এবং তাহার পরে আগাছা তুলিয়া ফেলা হয়।

ঢাকা এবং ফরিদপুরের নীচু জলাভূমি বা ঝিলে, লম্বা গুঁড়িযুক্ত এক প্রকার ধান প্রচুর জন্মে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫ হইতে ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত হয়। এই প্রকার চাষের জন্য পূর্ব্ব বৎসরের মুথাগুলি পোড়াইয়া ফেলা হয় এবং সাধারণতঃ

২

পৌষ কিংবা মাঘমাসে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। চৈত্র পর্য্যন্ত জমি এই অবস্থায়ই ফেলিয়া রাখা হয়, তাহার পরে ঢেলা ভাঙ্গা হয়, জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়, মই ব্যবহার করা হয় এবং প্রতি একরে একমণ হিসাবে বীজ ছড়ানো হয়। পরে জমিতে দুইবার মই দেওয়া হয় এবং আগাছা তুলিয়া দেওয়া হয়। ফলন গড়ে প্রায় প্রতি একরে ২৪ মণ।

অঘানি—অগ্রহায়ণ মাসে পাকে বলিয়া ইহার নাম অঘানি। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। অঘানি ধানের চাষ বাংলার সর্ব্বত্র হয়। ত্রিহুত জেলায় প্রায় ৩৩ রকম অঘানি ধান আছে। পাটনা জেলাতে প্রধানতঃ অঘানি ধানের আবাদ হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে প্রায় ৪৬ রকম অঘানি ধান আছে। বাখরগঞ্জ জেলাতেও অঘানি ধানের আবাদ অধিক। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি পড়িলেই ধান বোনা হয়; কোথাও বা ঐ সময় তলা ফেলিয়া আষাঢ় মাসে ধান রোয়া হয়। রোয়া অঘানি কিম্বা বোনা অঘানি ঠিক এক সময়েই পাকে।

ভাদুই—ইহা এক জাতীয় ধানের নাম; ইহাও অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। এই ধান সাধারণতঃ ৬০ দিনে পাকে। চম্পারণ জেলায় ইহা বৈশাখ মাসে উঁচু জমিতে বোনা হয়। সাহাবাদে আষাঢ় শ্রাবণে, গয়ায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে, ত্রিহুতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। কোথাও কোথাও আউশ ধানকেই ভাদুই ধান বলা হয় এবং আউশের সহিত

ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। শরৎকালে (ভাদ্র ও আশ্বিনে) ফসল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদুই ধান হইয়াছে।

আশ্বিনি—শরৎকালে পাকে বলিয়া এই জাতীয় ধানের নাম আশ্বিনি ধান। এই ধানের বীজ বালেশ্বর জেলায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বোনা হয়, আশ্বিন কার্ত্তিকে ধান পাকে। চাউল বেশ সাদা, স্বাস্থ্যকর এবং খুব মোটা নহে। বাখরগঞ্জেও এই জাতীয় ধান আছে। শ্রীহট্ট জেলায় জলা জমিতে এই নামে একজাতীয় লম্বা ডাঁটাযুক্ত ধানের আবাদ হয়। ১৫ ফিট পর্য্যন্ত গভীর জলেও এই ধান জন্মায়, জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানের ডাঁটা বাড়িতে থাকে।

আশ্বিনা—ইহা পুরী জেলায় এক জাতীয় ধান। সরস উচ্চ জমিতে ইহার আবাদ হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বপন কার্য্য শেষ হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ধান পাকে। রঙ্গপুরে এক প্রকার রোয়া ধান আছে। ময়মনসিংহে ঐ নামের আমন ধান আছে।

বারমেসে ধান—পুরী যাইবার পথে, পুরীধামের সন্নিকটে লক্ষ্মীজলা নামে একটি জলা আছে। তথায় বারমাস ধানের চাষ হয়। কোন ক্ষেতে দেখিবে যে সবে মাত্র ধানের চারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতেছে, পাশের ক্ষেতে ধানের শীষ বাহির হইতেছে, কিয়দ্দূরে ধান পুষ্ট হইয়া আসিতেছে, আবার অন্য কোন ক্ষেতে দেখা যায় ধান পাকিয়া কাটিবার উপযুক্ত

হইয়াছে। ইহা ধানের গুণ কিম্বা জলার গুণ তাহা বলা কঠিন; অথবা এই অঞ্চলে বীজ, ক্ষেত্র ও চাষের উৎকর্ষতাও ঐরূপ বৈষম্যের কারণ হইতে পারে। বর্ষার সময় যখন জলার জল বাড়ে তখন রোপণের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্য সময় বোনাই ব্যবস্থা। এই ধানের চাল খুব মিহিও নহে, কিম্বা মোটা নহে। ভাত নরম ও সুস্বাদু হয়। লক্ষ্মীজলা সত্যসত্যই লক্ষ্মীর লীলা-ক্ষেত্র।

বাদসা ভোগ—ডুমরাঁর পরীক্ষাক্ষেত্রে ইহার বহুবার চাষ হইয়াছে। বাঙ্গালার অনেক স্থানে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; বর্দ্ধমানে ইহার চাষ সমধিক। ফলন ক্ষেত্র বিশেষে বিঘা প্রতি ৬/০ মণ হইতে ১০/০ মণ। বিল জমিতে ইহার চাষ হয় না। ইহার চাউল ছোট, মিহি ও সুগন্ধযুক্ত। হুগলী, বর্দ্ধমান, কটক, বালেশ্বর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি অনেক জেলায় ইহার চাষ হইতেছে।

বেগুন বীচি—বেগুন বীচির মত ছোট ও সরু চাউল হয়। ২৪ পরগণায় ইহার চাষ আছে এবং বাঙ্গালার একাধিক জেলায় ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নামে দিনাজপুরে এক প্রকার মোটা ধান আছে। ইহার ধান পাকিতে দীর্ঘ সময় লাগে। বগুড়া ও নদীয়ায় বেগুনবীচিও মোটা ধান। ফরিদপুরে বেগুনবীচি নামে আউশ ধান আছে।

বাঁকুই—ইহা মেদিনীপুরের রোপা ধান। ফরিদপুরে ঐ নামে আউশ ধান আছে। হুগলী জেলায় আমতার সন্নিকটে

বাঁকই নামে জলিধান আছে। বিল জমিতে ইহার আবাদ হয়। ধান পাটনাইয়ের মত।

বালাম—বাংলার ইহা একটি বিখ্যাত আমন ধান। বাংলার নানাস্থানে ইহার চাষ হয়, তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গেই অধিক। খুব উঁচুও নহে নীচুও নহে এরূপ জমিতে ইহার আবাদ ভাল হয়। বিঘাপ্রতি ফলন ৬/০ হইতে ৮/০ মণ। অগ্রহায়ণের প্রথমেই ধান কাটা হয়।

বাঁকচুর—ইহার চাষ ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমানে অধিক। গোড়ায় ৩ হাত জল থাকিলেও ভাল হয় এবং গাছ তিন ভাগ জলে নিমজ্জিত থাকিলে ফলন সুবিধা হয়।

বিয়ানি—উড়িষ্যা দেশের ধান। উচ্চ সরস জমিতে ইহার বুনানি হয়। পুরীতে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে চাষ আরম্ভ হয় এবং কার্ত্তিকে ধান কাটা শেষ হয়। কটকেও বাংলার আউশ বা ভাদুই ধানের মত ইহার চাষ হয়।

বোকা—ইহা আসাম দেশের আমন ধান। ইহার চাউল সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয় না। চাউল কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলেই ভাতের মত নরম হয়। হুগলী জেলাতে ইহার চাষ আছে।

বুনা—ইহা দিনাজপুরের একপ্রকার রোপা ধান। রাজসাহীতে ঐ নামে বাড়ান আমন আছে। তথায় বিল জমিতে ইহার চাষ হয়। গাছ খুব বড় হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট জেলায়ও ইহার চাষ আছে। বিল জমিতে বীজ ছিটাইয়া

দিলেও কোন যত্ন ব্যতীতও ধান জন্মে ; এই কারণে ইহাকে বুনা বা বুনো ধান বলে।

চাঁপা—দার্জ্জিলিঙে এই নামে আউশ ধান আছে। ২৪-পরগণায় চাঁপা নামে আমন ধানের চাষ হয়। প্রথম বৃষ্টিপাত হইলেই নিম্নতর জমিতে ইহার বুনানি করিয়া চাষ আরম্ভ হয়। বালেশ্বরের একপ্রকার নয়ালি (আউশ) ধান উঁচু জমিতে ইহা বোনা হয়। আশ্বিন কাত্তিক মাসে ধান পাকে। চাউল মোটা কিন্তু স্বাস্থ্যপ্রদ। কটকেও ইহার চাষ আছে।

ছত্রভোগ—চেঙ্গা নামে রংপুর, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর অঞ্চলে লম্বা ডাঁটাযুক্ত কয়েক প্রকার ধান আছে।

ছোটনা আমন—ইহা এক জাতীয় আমন ধান। ফরিদপুরে ইহার চাষ অধিক। প্রকারভেদে ইহা প্রায় ২৩ রকম। নিম্ন জলা জমিতে ইহার চাষ হয়। চৈত্রমাসে ইহার বুনানি স্নুরু হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ইহার ধান কাটা শেষ হয়।

চিনিসাগর, চিনিশর্কর, চিনিশর্কর—বাখরগঞ্জ, ঢাকা, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। ইহার চাউল মিহি ও সুস্বাদু। ইহার আতপ চাউলের প্রচলনই বেশী।

দালকচু—দার্জ্জিলিঙের হৈমন্তিক ধান। যশোহর, বগুড়া, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও আসামে ইহার চাষ আছে নিম্ন জমিতে চাষ হয়, গাছ বড় হয়।

ধলি—২৪ পরগণার ধান। ধান সাদা হয় বলিয়া ইহার নাম ধলি হইয়াছে।

ধুলিয়া—মেদিনীপুর জেলার আমন ধান। ইহা বপন করিয়া চাষ হয়। শ্রীহট্ট ও বালেশ্বরও ইহার চাষ আছে।

দুধরাজ—ফরিদপুরের ধান। চাউল দুধের মত খুব সাদা বলিয়া এই নাম হইয়াছে, চাউল উৎকৃষ্ট। পূর্ণিয়া জেলায় এই নামে মোটা অঘানি ধান আছে। ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহে ঐ নামে আমন ধান আছে। ত্রিহুতে ইহা অঘানি ধান। পাটনায় ইহা মোটা অঘানি। দ্বারভাঙ্গায় ইহার চাষ আছে।

দুর্গাভোগ—মেদিনীপুরের ইহা আউশ ধান, কিন্তু ২৪ পরগণায় ইহা আমন ধানের মত নীচুজমিতে বপন করিয়া চাষ হয়। সুন্দরবনে ইহা আউসের মত চাষ করা হয়। কটকে ইহা বোনা ধান।

গজগরিয়া—রঙ্গপুরে ইহা রোপা ধান। বগুড়াতেও ইহার চাষ আছে। এই ধানে ভাল খৈ প্রস্তুত হয়।

গোবিন্দভোগ—বীরভূমের রোপা আমন। ঢাকা, ত্রিপুরা ও যশোহরে ইহার চাষ আছে। ইহার চাউল খুব মিহি ও ইহার ভাত খুব সুগন্ধযুক্ত।

হরিশঙ্কর—ইহা উড়িষ্যার বোরো জাতীয় ধান। চাউল মোটা হয়; প্রায়ই গরীব লোকে খাইয়া থাকে। নিম্ন জমিতে আবাদ হয়, গোড়ায় ২।৩ হাত জল থাকা আবশ্যক। ইহা রঙ্গপুরেরও একটি রোপা ধান।

হাতিশাল—ইহা বাংলার এক প্রকার মোটা ধান। কটক ও রাজসাহী জেলার ক্ষেত্রে ইহার পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা হইয়াছে। চাউল লম্বা, খুব মোটা নহে, রঙ কিঞ্চিৎ কাল। ফলন প্রতি বিঘায় ৮৴০ মণ হইতে ১০৴০ মণ।

জোঙ্গা—ইহা মুঙ্গেরের হৈমন্তিক ধান এবং ভাগলপুরেরও রোপা ধান; কিন্তু সাঁওতাল পরগণায় আউশের মত চাষ হয়।

কালীজিরা—বাঁকুড়া জেলার আমন ধান। বীরভূম, মেদিনীপুর, কটক প্রভৃতি স্থানে ইহার আবাদ আছে। ধান কাল, খর্ব্বাকৃতি, চাউল খুব মিহি নহে।

কালামাণিক—ইহা ময়মনসিংহের আউশ ধান। বৈশাখ মাসে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত নীরস জমিতে ইহার আবাদ হয়; কিন্তু নোয়াখালিতে ইহার আবাদ আমনের মত। রাখরগঞ্জে ইহার ফলন অধিক।

কালিজিরা—ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং কাছাড়ে এই জাতীয় ধানের চাষ আছে। ইহা রোপা ধানের মধ্যে পরিগণিত। ত্রিপুরা, সাঁওতাল পরগণায় ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ইহার চাউল খুব মিহি এবং ভাত খুব সুগন্ধযুক্ত।

কমলভোগ—ইহা বাংলার একটি প্রধান ধান। ইহাকে পাটনাই জাতীয় ধান্য বলিলেও বলা যায়। চট্টগ্রাম ও ২৪ পরগণায় ইহার চাষ অধিক। ইহার চাউল লম্বা, খুব মোটা নহে।

কামিনী বা কামিনী সরু—২৪ পরগণার ধান। চাউল মিহি ও ভাত সুগন্ধযুক্ত, নিম্ন জমিতে জন্মে। হাওড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ইহার আবাদ হইয়া থাকে।

রাধুনীপাগল—ইহার চাউল হইতে রন্ধনকালে সুগন্ধ বাহির হয় এবং রাধুনীকে গন্ধে মাতাইয়া তুলে। ইহা আমন জাতীয় ধান। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বোনা হয়, অগ্রহায়ণ পৌষে ধান কাটা হয়।

রাইমুথী—ময়মনসিংহের আমন ধান। প্রধানতঃ ইহার বুনানী হয়, কখন বা রোপণ করা হইয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বুনান হয়। ইহা উচ্চধরণের অপেক্ষাকৃত নীরস জমিতে ভাল জন্মিয়া থাকে।

রাজভোগ—ইহা বাখরগঞ্জের একপ্রকার ধান; রংপুরেও ইহার চাষ আছে। ইহা রোপা ধান। ২৪ পরগণায়ও রাজভোগ ধান আছে। এখানে ইহার বুনান হয় এবং এই দুই জেলার ধানের আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

রাজপাল—ইহাও বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহের আমন ধান। বুনান করিয়া চাষ হয়। বগুড়া ও পাবনাতেও ইহার আবাদ আছে, সর্ব্বত্রই বুনান হয়।

রামশাল—ইহা আমন ধান বুনান করিয়া ইহার চাষ হয়। সাহাবাদে এবং অন্যান্য কোন কোন স্থানে রোপা ধানের মত ইহার আবাদ হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ২৪ পরগণায় ইহার চাষ আছে। ২৪ পরগণায়

ইহাকে পাটনাই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হয়। পাটনাইয়ের মত ইহার চাউল অপেক্ষাকৃত একটু মোটা হয়। রোপার মত আবাদ করিলে ধান কিছু মিহি হয়। সতেজ জমি হইলে ২৪ পরগণায় বিঘাতে ৮/ মণ, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় ১০/ মণ পর্য্যন্ত ফলে।

রাঙ্গি—ইহা ২৪ পরগণার একটি মোটা ধান। মুর্শিদাবাদ, রাখরগঞ্জ ও ভাগলপুরে রোপা ধানের মত ইহার আবাদ হয়। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ইহার বুনান হয়। ধানের রং লাল বলিয়া ইহার রাঙ্গি নাম হইয়াছে।

শাইল—শ্রীহট্টে ও কাছাড়ে এই নামে ধান আছে। নদীয়া ও নোয়াখালিতে ইহা আউশের মত আবাদ হয়, রাজসাহী ও জলপাইগুড়িতে আমনের মত চাষ হয়। দিনাজপুরে ইহা ভাদুই ধান। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে সাধারণতঃ হৈমন্তিক যে কোন ধানকে শাইল বা শালি ধান বলে।

সমুদ্রবালি—ইহা বিহারের মিহি ধান। ডুঁমরাও ও কটকে এবং শিবপুর গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে ইহার বহুবার পরীক্ষা হইয়াছে। চাউল খুব মিহি হয়। ফলন বিঘা প্রতি ৪/০ মণের অধিক হয় না। বীরভূমে ইহার আবাদ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

সমুদ্রফেনা—ফরিদপুরের বুনান ধান। নিম্ন জমিতে ইহার চাষ হয়; ধান মোটা। বগুড়াতে আউসের মত ইহার আবাদ হয়।

ষাঠী বা ষষ্টি—৬০ দিনে পাকে বলিয়া এই নাম হইয়াছে বাংলা ও ভাগলপুরে আউসের মত ইহার চাষ হয়। ধান মোটা। সারণ, চম্পারণ এবং কানপুর প্রভৃতি স্থানে ভাদুই ফসলের সঙ্গে ইহার আবাদ হয়।

সীতাভোগ—হাজারিবাগে ইহার চাষ সমধিক। লোহার-ডগায় দোন জমিতে ইহার আবাদ হয়। ঐ সকল স্থান হইতে ইহা বাংলায় আসিয়াছে। তথায় বিল জমিতে চাষ হয়। গাছ খুব লম্বা হয়। বাখরগঞ্জে ঐ নামে ছোট গাছ হয় এবং সাধারণ শালি জমিতে জন্মায় এমন ধান আছে। প্রথমটি মোটা, শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত মিহি।

সিঁদুর কৌটা—রঙপুর ও দিনাজপুরের আমন ধান ইহা রোপন করা হয়। দার্জ্জিলিং ও তরাই প্রদেশে ইহার চাষ আছে। তথায় এই ধান অধিক মোটা হয় এবং সেখানে ইহার বুনান হইয়া থাকে। অনেকে বলে যে প্রকৃত সিঁদুর কৌটা ধান ফরিদপুরেই জন্মিয়া থাকে।

সোনামুখী—ইহা চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের ধান; নোয়াখালীতেও ইহার চাষ আছে।

সুরীধান—পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম প্রদেশে এই নামের ধান আছে।

সুর্য্যো ও সূর্য্যজটে—এই দুইটি মালদহের ধান। গোড়ায় খুব কম জল থাকিলে জন্মিয়া থাকে। ইহা খুব জলদি বুনান হয় এবং কার্ত্তিক মাসেই ধান কাটা চলে।

সুধাভোগ—বর্দ্ধমানের ধান, চাউল খুব মিহি। ফলন বিঘাপ্রতি ৫/০ মণের অধিক নহে। অল্প জলে হয়। এখান হইতে বোম্বাই প্রদেশে ও কটকে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কটক গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে ইহার বারম্বার পরীক্ষা হইয়াছে।

সুখদাস—কখন কখন এই নামের মিহি চাউল কলিকাতার বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কাশ্মীরের ধান। ইহা হইতে সাদা সরু চাউল উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে ইহার চাষ অধিক। পাটনাতেও ইহার চাষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। এখানে ইহা রোপা ধানের মত চাষ হইয়া থাকে।

সুন্দরশাল—ইহা মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার আমন ধান, ইহা বোনা ধান। ২৪ পরগণায়, সুন্দরবন অঞ্চলে নিম্ন জমিতে ইহার আবাদ হয়। জমি ভাল হইলে ধানের ফলন বিঘা প্রতি ১০/০ মণেরও অধিক হইয়া থাকে। এই ধান ৪।৫ ফিট জলেও জন্মিতে পারে।

সূর্য্যমণি ও সূর্য্যমুখী—নদীয়া ও বাখরগঞ্জের আউশ ধান। বগুড়াতে আমনের মত চাষ করা হয়। ইহার বুনান ভিন্ন রোপণ হয় না। পূর্ণিয়া জেলার ইহা অঘানি ধান। তথায় ইহার রোপণ হয়। পূর্ণিয়ার সূর্য্যমুখী ও সূর্য্যমণি ধান খুব মিহি। রঙপুরে শ্যামলাল, শ্যামরাজ, শ্যামরস নামে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি সবই রোপা ধান।

শ্যামরথ—কুচবিহারের রোপা ধান। শ্যামরথ ধানের চাষ কুচবিহারেও দেখিতে পাওয়া যায়।

গোপালভোগ—আমন ধান। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় উচ্চ জমিতে উৎপন্ন হয়। আশ্বিন মাসে অনাবৃষ্টিতে কৃষকেরা এই ধান্যের আবাদ করিয়া থাকে। চাউল মাঝারি ও খুব সাদা। এই ধান্য নভেম্বরের শেষভাগে পাকিয়া থাকে। ফলন বিঘাপ্রতি ১০/ মণ। ইহার খড় বেশ লম্বা ও সরু।

লালকলমা—নিম্ন জমির আমন ধান। হুগলী, বর্দ্ধমান ও হাওড়া জেলায় অপেক্ষাকৃত নিম্নজমিতে চাষ হইয়া থাকে। ধান গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, চাউল শ্বেতবর্ণ ও মোটা বিঘাপ্রতি ১২/০ মণ পর্য্যন্ত ধান জন্মিয়া থাকে। এই ধান ডিসেম্বরের মধ্যভাগে পাকিয়া থাকে। খড় মোটা ও লম্বা।

বাদসাহ্‌ভোগ—আমন ধান, হুগলী ও বর্দ্ধমানে জন্মিয়া থাকে। চাউল ছোট মিহি ও সুগন্ধযুক্ত। এই চাউলের পোলাও বেশ প্রীতিপ্রদ। বিঘাপ্রতি ১১/০ মণ ধান ফলিয়া থাকে। খড় সরু ও লম্বা। সচরাচর নবেম্বর মাসে পাকিয়া থাকে। বিঘাপ্রতি ৫/০ মণ গোবর সার দিলে ধানের বেশ ফসল হয়। অনুর্ব্বর জমিতে এই ধান্য ভাল হয় না। বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রাম ষ্টেশনের নিকট ইহার চাষ আছে। এই ধানের আতপ চাউল বেশ ভাল হয়। চাউল নাগরা অপেক্ষা ৬৲ টাকা বেশী দরে বিক্রয় হয়।

জুরে—নিম্ন জমিতে এই ধান্য উৎপাদিত হয়। ৩০শে নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর এই ধান পাকে; এই কারণে উচ্চ জমিতে এই ধান্য রোপন করা যাইতে পারে না।

যে সকল জলা জমিতে ২।৩ ফুট জল জমিয়া থাকে সেই জমি এই ধান্য চাষের উপযুক্ত। ফলন বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ। খড় মোটা ও শক্ত।

কয়াধান্য—উচ্চ বনের ধারের জমিতে ধান্য রোপণ করিলে পক্ষী, বন্য শূকর বা গরু মহিষে খাইতে পারে না। ধানের লম্বা লম্বা শোঁয়া থাকার জন্য, পক্ষী ও গো-মহিষাদির জিহ্বায় উহা বিঁধিয়া যায়। ৩০শে কার্ত্তিকের মধ্যে এই ধান পাকিয়া থাকে; ফলন বিঘা প্রতি ১০/ মণ। খড় মাঝারি। এই ধান্য মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হইতেছে।

শলা কার্ত্তিক—উচ্চ জমির আমন ধান। ফলন বিঘা প্রতি ১২/ মণ। খড় নরম, ধানের ঝাড় বেশ মোটা হয়, পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। ইহার চাউল মোটা ও লাল দাগ বিশিষ্ট, ভাল করিয়া ঢেঁকিতে ভানিলেও চাউলের লাল দাগ বেশ পরিষ্কার হয় না।

কাল হিংচে—আমন ধান, আকৃতিতে ঝিঙে শাল ধানের ন্যায় ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ ও লম্বা। চাউল শ্বেতবর্ণ ও লম্বা। খড় শক্ত ও লম্বা মেটে ঘর ছাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত। ফলন বিঘা প্রতি ১০/ মণ। ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে পাকিবার সময়। এই ধান হুগলী ও বর্দ্ধমানে অল্প পরিমাণে চাষ হয়।

কনকচুড়—নিম্ন জমির আমন ধান। পাকিবার সময় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। এই ধানের খৈ হইতে ভাল মুড়কী

প্রস্তুত হয়। ধান দেখিতে মোটা ও বেঁটে। ফলন বিঘা প্রতি ১২।১৪ মণ। জমিতে ৪।৫ ফুট জলের আবশ্যক হয়। খড় মোটা ও লম্বা। এই ধানের খৈ ভাল হয় বলিয়া ৬।৭ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় কেবলমাত্র নিম্ন জমিতে এই ধানের আবাদ হয়। উচ্চ জমি এই ধানের পক্ষে উপযুক্ত নহে।

দক্ষিণিধলি—উচ্চ জমির আবাদী ধান। পাকিবার সময় নভেম্বর মাস। ফলন মিঘা প্রতি ১০/ মণ। চাউল মাঝারি ও ঈষৎ লালচে রং বিশিষ্ট। খড় লম্বা ও শক্ত। শীঘ্র পাকে বলিয়া হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার উচ্চ জমিতে কৃষকেরা ইহার আবাদ করে। ধানের রং ঈষৎ হল্‌দে।

নেবুশাল—এই ধান হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার উঁচু জমিতে অধিক পরিমাণে চাষ হয়। ধানের রং গাঢ় হিঙ্গুলের ন্যায়, চাউল খুব সাদা, খুব মোটা নহে। ফলন বিঘা প্রতি ১১ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগ।

হাতীশাল—নিম্ন ও উচ্চ জমির আমন ধান। নিম্ন জমিতেই বেশ ফলন হইয়া থাকে। ফলন বিঘা প্রতি ১২/০ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগ। খড় খুব বড়, লম্বা ও মোটা। হুগলী, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

মেঘী—নিম্ন জমির আমন ধান। ৬ ফুট জলে এই ধান্য জন্মে। জলা জমি ভিন্ন এই ধান্য হয় না। ধান সাদা ও গায়ে পিঙ্গল বর্ণের দাগ বিশিষ্ট। চাউল মোটা,

বেঁটে ও সাদা। ফলন বিঘা প্রতি ১৫/ মণ। এই ধান্য ৭ হাত জলেও উৎপন্ন হয়। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ইহা পাকিয়া থাকে।

আশ্বিন শাল—উচ্চ জমির আমন ধান। এই ধান আউস ধান্যের পরই অক্টোবর মাসের শেষভাগে পাকিয়া থাকে। ধান কাটিয়া সেই জমিতে ছোলা, মটর, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্যের চাষ করা যাইতে পারে। চাউল শ্বেতবর্ণ। ধান্যের ভাত ও মুড়ি খুব ভাল হয়। এই ধান্য শীঘ্র পাকে বলিয়া ভামা পোকায় ইহার বড়ই ক্ষতি করে। পোকা ধরে বলিয়া চাষীরা এই ধান্যের চাষ করিতে ইচ্ছা করে না। ফলন বিঘা প্রতি ১১/ মণ। খড় খুব ভাল। ধান্যের ঝাড় খুব বড় হয়।

দক্ষিণে নাগরা—উচ্চ জমির আমন ধান ফলন বিঘা প্রতি ১০/ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগ। খড় সরু শক্ত। চাউল মাঝারী ও ঈষৎ লালচে রং বিশিষ্ট। হুগলী ও বর্দ্ধমানে ইহার চাষ হইয়া থাকে।

কটে ধলি—উচ্চ জমির জেঠ ধান। ফলন বিঘা প্রতি ১১/ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের মধ্যভাগ চাউল বেঁটে ও মোটা; গায়ে লাল বর্ণের ছাল আছে। ভাত একেবারে সাদা হয়। চাউল মধ্যম।

পান্তারাজ—নিম্ন জমির আমন ধান। ৬।৭ ফুট জলেও ইহা বেশ জন্মিয়া থাকে। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় প্রচুর

চাষ হয়। চাকদিঘি হইতে চৌবেড়া পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জেলায় যে সকল নিম্ন জমি দেখা যায় তথায় এই ধান্যের প্রচুর চাষ আছে। বর্দ্ধমান জেলায় হিরণ্য গ্রামের একটি জলা জমিতে প্রতি বৎসর এই ধান দেখা যায়। ফলন বিঘা প্রতি ১৫/ মণ। পাকিবার সময় ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে।

মাগুরশাল—নিম্ন জমির আমন ধান। ফলন বিঘা প্রতি ১২/ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগ। ধানের রং গাঢ় পীত। চাউল সাদা ও মোটা। মুড়ি মোটা ও শক্ত হয়। ভাত মোটা ও নরম। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় নিম্ন জমিতে চাষ হয়।

রাণী পাগল—উচ্চ ও নিম্ন জমির আমন ধান। ফলন বিঘাপ্রতি ৮/ মণ। খড় লম্বা ও সরু। পাকিবার সময় ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে। হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া থানায় ইহার চাষ হয়; ধান কালো ও ছোট। চাউল সাদা, পোলাও বেশ ভাল হয়।

লাবণ্যশাল—উচ্চ জমির আমন ধান। এই ধান দেখিতে বেশ চক্‌চকে ও সাদা, চাউল সরু; ভাত বেশ ভাল হয়। ফলন বিঘা প্রতি ১০/ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। খড় সরু ও লম্বা; দেখিতে খুব চক্‌চকে। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার উচ্চ জমিতে রোপণ করা হয়।

ভাসামাণিক—উচ্চ জমির আমন ধান। হুগলী, বর্দ্ধমান

ও বাঁকুড়া জেলায় এই ধানের চাষ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ৮৴ মণ হিসাবে ইহার ফলন। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। খড় লম্বা ও নরম। চাউল সাদা ও লম্বা অল্প জলে এই ধান রোপণ করা চলে।

নাগরা—হুগলী, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় বহু জমিতে এই ধানের আবাদ হয়। হুগলী জেলায় শতকরা ৪০ বিঘা জমিতে ইহার চাষ হয়। ফলন বিঘা প্রতি ১২৴ মণ। নিম্ন জমিতে চাষ করা আবশ্যক। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগে। খড় শক্ত ও লম্বা। এই খড়ে ঘর ছাউনির পক্ষে উৎকৃষ্ট; ধানের ঝাড় খুব মোটা হয়।

দেশী ঝিঙেশাল—নিম্ন জমির আমন ধান। ধানের রং ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, চাউল সাদা ও সামান্য লম্বা। ফলন বিঘাপ্রতি ১১৴ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগ। খড় ছোট; ঝাড় বড় হয়। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় ইহার চাষ হয়। ধান একটু বেঁটে।

ক্ষেপা ঝিঙেশাল—নিম্ন জমির ধান। ধানে শোঁয়া আছে। ধান ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। ফলন বিঘাপ্রতি ১২৴ মণ। খড় বড়; ঝাড়ে সরু ও লম্বা শিষ থাকে। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগ। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় বিস্তর জমিতে ইহার চাষ হয়। এই ধানের মুড়ি খুব ভাল হয়। চাউল সাদা ও লম্বা।

রাজ ঝিঙেশাল—নিম্ন জমির ধান। খড় লম্বা, ঝাড়

মোটা, চাউল সাদা ও লম্বা। * পাকিবার সময় নভেম্বর' মাসের শেষভাগ। ফলন বিঘাপ্রতি ১২/ মণ; খড় শক্ত ও লম্বা; ঘর ছাউনির পক্ষে খড় উৎকৃষ্ট। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় প্রায় শতকরা ৩০ বিঘা জমিতে ইহার চাষ হয়।

ধলে কলমা—উচ্চ ও নিম্ন জমির ধান। ধানের রং সাদা; চাউল খর্ব্বাকৃতি ও সাদা। খড় মাঝারি ও শক্ত। ফলন বিঘাপ্রতি ১০/ মণ। নভেম্বর মাসের শেষভাগে পাকে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদিঘী, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক জমিতে ইহার আবাদ হইতে দেখা যায়।

সুন্দরমুখী—নিম্ন জমির আমন ধান। ধান পিঙ্গল বর্ণ; চাউল লম্বা ও সাদা। ফলন বিঘা প্রতি ১০/ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগ। হুগলী জেলার গুড়াপ ষ্টেশনের নিকট এই ধানের চাষ হয়। বর্দ্ধমান জেলার মেমারীর নিকটবর্ত্তী স্থানে দুই একখানি জমিতে এই ধান দেখা যায়। খড় মোটা ও লম্বা।

পর্ব্বতজিরে—উচ্চ জমির আমন ধান। বর্দ্ধমান জেলায় দুই একখানি জমিতে এই ধান্য দেখা যায়। জামালপুর থানার হিরণ্য গ্রামে দশ কাঠা একটি জমিতে এই ধান্য বেশ হইয়াছে। খড় লম্বা ও মোটা। চাউল সরু; ভাত সুগন্ধযুক্ত। ফলন বিঘাপ্রতি ১০।১১/ মণ। পাকিবার সময় ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগ।

খয়ের মৌরী—নিম্ন ও উচ্চ জমির আমন ধান। ফলন

বিঘাপ্রতি ৮৲ মণ। ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে পাকে। খড় লম্বা ও শক্ত। চাউল ছোট খর্ব্বাকৃতি। ধানের অগ্রভাগে কাল দাগ আছে। হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া থানায় এই ধানের চাষ হয়। সাধারণতঃ পোলাও রান্নায় এই চাউল ব্যবহৃত হয়। ফলন ভাল নয় বলিয়া লোকে এই ধান্যের চাষ অল্প পরিমাণে করিয়া থাকে।

কটেনোনা—নিম্ন জমির আমন ধান। ফলন বিঘাপ্রতি ১১৲ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগ। খড় ছোট ও শক্ত। হুগলী ও বর্দ্ধমানে ইহার চাষ হয়। চাউল তসর রংয়ের ও মোটা।

কানে কলন—উচ্চ জমির আমন ধান। ফলন বিঘাপ্রতি ১২৲ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। খড় লম্বা, শক্ত ও রংদার। চাউল সাদা ও লম্বা। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় ইহার চাষ হয়। বর্দ্ধমান জেলার চকদিঘীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু পরিমাণে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। জমিতে ২ ফুট জলের আবশ্যক হয়। চাউল বাঁকতুলসীর ন্যায় সরু এবং একটু লম্বাকৃতি। ভাত খুব ভাল হয়।

ছোট ধ্বলি—উচ্চ জমির আমন ধান। ধান খর্ব্বাকৃতি, দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ, মধ্যস্থলে গাঢ় পিঙ্গলবর্ণের দাগ বিশিষ্ট। চাউল লাল ও মোটা। ভাত ভাল নহে। ফলন বিঘাপ্রতি ১২৲ মণ। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে পাকে। হুগলী ও বর্দ্ধমানের ধান।

বাঁক তুলসী—উচ্চ জমির আমন ধান। ধান দেখিতে কতকটা সাদা ও লম্বা। চাউল মিহি ও খুব সাদা। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। ফলন বিঘা প্রতি ১০/ মণ। খড় লম্বা ; ধানের ঝাড় খুব কম হয়। হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ইহার চাষ হয়। মোটা ধানের চাউল অপেক্ষা ২৲ টাকা বেশী দরে এই চাউল বিক্রয় হয়।

গেঁটে কলমা—নিম্ন জমির আমন ধান। লাল ফরসা ধানের ন্যায় ধান তবে একটু খর্ব্বাকৃতি। চাউল সাদা ও মোটা। ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে পাকে। ফলন বিঘাপ্রতি ১২/ মণ। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় সচরাচর ইহার চাষ হয়।

কার্ত্তিক শাল—উচ্চ জমির আমন ধান। খড় খুব ভাল। ধান মাঝারি, দেখিতে নাগরা ধানের ন্যায়। চাউল একটু তম্বুরে রংয়ের। অক্টোবর মাসের শেষভাগে পাকে। ধান কাটিয়া সেই জমিতে ছোলা ও মটর বোনা চলে। ফসল বিঘাপ্রতি ১০।১১/ মণ। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় ইহার চাষ হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে অনাবৃষ্টি হইলে এই ধান পাকিবার কোন বিঘ্ন হয় না।

নীহারা—আমন ধান, উচ্চ জমিতে চাষ হয়। ধান নাগরার ন্যায় ; চাউল ঈষৎ লাল। ফলন বিঘাপ্রতি ১০/ মণ। কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে ধান পাকিয়া থাকে। হুগলী, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় ইহার চাষ হয়। খড় নরম ও লম্বা।

জটাকলমা—নিম্ন জমির মোটা ধান। ধানের অগ্রভাগে

ছোট শুঁয়া আছে। চাউল মোটা। মুড়ি ভাল হয়; কিন্তু খাইতে একটু শক্ত বলিয়া বোধ হয়। চাউল সাদা; ভাত মোটা। ফসল বিঘাপ্রতি ১২/ মণ। পাকিবার সময় ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগ। হুগলী, বর্দ্ধমান ও হাওড়ায় ইহার চাষ হয়। খড়ের গোড়া লাল ও লম্বা।

গন্ধরাজ—আমন জমির সরু ধান। ধান দেখিতে অনেকটা বেনা ফুল ধানের ন্যায়। চাউল সুগন্ধযুক্ত ও সরু। চাউল নাগরা অপেক্ষা প্রতি মণ ২৷৩ টাকা অধিক দরে বিক্রয় হয়। ধানের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ, ফলন বিঘাপ্রতি ১০/ মণ। নভেম্বর মাসের শেষভাগে পাকে। হুগলী ও বর্দ্ধমানে চাষ হয়। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানায় এই ধানের অধিক চাষ আছে।

দুধেনোনা—নিম্ন জমির আমন ধান। ধানের অগ্রভাগে লম্বা শুঁয়া আছে। চাউল সাদা ও লম্বা। ফলন বিঘাপ্রতি ১২/ মণ। পাকে ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে। খড় লম্বা ও শক্ত। মুড়ি ভাল হয়। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় নিম্ন জমিতে চাষ হয়।

বাঁকচুর—উচ্চ জমির ধান। ধান সাদা, লম্বা ও সরু। চাউল লম্বা, শ্বেতবর্ণ, ভাত খুব ভাল হয়। বাঁকতুলসী অপেক্ষা ইহার চাউল কোন অংশে হীন নহে। ফলন বিঘাপ্রতি ১০/ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। হুগলী ও বর্দ্ধমানে ইহার চাষ হয়।

দাদখানি—সরু ও লম্বা আমন ধান। চাউল অতিশয়

সরু ও উৎকৃষ্ট এবং নাগরার চাউল অপেক্ষা প্রতি মণ ৪৲ টাকা বেশী দরে বিক্রয় হয়। পুরাতন দাদখানি চাউল রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ফলন বিঘাপ্রতি ১২/ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগ। ধান দেখিতে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের, অনেকটা ঝিঙেসাল ধান্যের ন্যায়। হুগলী ও বর্দ্ধমানে বহু পরিমাণে ডাঙ্গা মাটিতে ইহার চাষ হয়। পাণ্ডুয়া থানায় দ্রাবিড় গ্রামে ইহার অনেক চাষ আছে।

বেলফুল—উচ্চ ও নিম্ন জমির ধান। ধান আকৃতিতে ছোট, সাদা ও হরিদ্রাভ। চাউল ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত। এই ধানের ভাত রাঁধিলে বাটীর চারিদিক গন্ধে আমোদিত হয়। চাউল নাগরা অপেক্ষা প্রতি মণ ৫৲ টাকা বেশী দরে বিক্রয় হয়। ফসল বিঘাপ্রতি ৮/ মণ। পাকে নভেম্বর মাসের শেষভাগে। ইহা অতি সৌখীন ধান। লোকে অল্প জমিতে এই ধান্যের আবাদ করে। ইহার চাউল বাজারে খুব কমই বাহির হয়। হুগলী ও বর্দ্ধমানে ইহার চাষ হয়। পাণ্ডুয়া থানার রামেশ্বরপুরে এই ধান্যের চাষ আছে।

মহীপাল—উচ্চ জমির আমন ধান। ধান সাদা ও মোটা। চাউল তম্বুরে রংয়ের। খড় নরম ও লম্বা। ফসল বিঘাপ্রতি ৫/ মণ। পাকে নভেম্বর মাসের শেষভাগে। এই ধানের চাউল বেশ ভাল নহে। হুগলী ও বর্দ্ধমানে ইহার চাষ হয়।

কামিনীশাল—উঁচু জমির ধান। চাউল বাঁকচুরের ন্যায়;

খুব সাদা ও লম্বা নহে, খর্ব্বাকৃতি। ধান সাদা। ফসল বিঘাপ্রতি ৬/ মণ। পাকে নভেম্বর মাসের শেষভাগে। হুগলী জেলার ধান। এই ধানের চিঁড়ে ভাল হয়।

নোনা—নিম্ন জমির মোটা ধান। এই ধান অনেকটা তুধেনোনার ন্যায় তবে ইহাতে শুঁয়া নাই এবং আকারে একটু ছোট, চাউল সাদা ও মোটা। মুড়ি ভাল হয়। ফসল বিঘাপ্রতি ১১/ মণ। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের শেষভাগ। হুগলী অপেক্ষা বর্দ্ধমান জেলায় ইহার অধিক চাষ হয়।

তুধকলমা—নিম্ন জমির আমন ধান। এই ধান তুধেনোনা অপেক্ষা ছোট। তুধকলমার শুঁয়া তুধেনোনা অপেক্ষা ছোট। তুধেনোনা ধান খুব সাদা কিন্তু এই ধান একটু সবুজের আভাযুক্ত। তুধেনোনার অগ্রভাগে কাল দাগ নাই, এই ধানের অগ্রভাগে কাল দাগ আছে।

বুয়ালদ—নিম্ন জমির ধান। চাউল মোটা ও লাল বর্ণ বিশিষ্ট, এবং বেশ ভাল করিয়া পরিষ্কার করিলে সাদা হয়। খড় মোটা ও লম্বা; ফলন বিঘাপ্রতি ১২/ মণ। ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে পাকে। বর্দ্ধমান জেলায় ইহার চাষ হয়।

পান্তিশাল—উঁচু জমির ধান। ধান মাঝারী, চাউল লাল ও খর্ব্বাকৃতি। ধান ভাল নহে, ইহার চাউল আউস ধান্যের ন্যায়। ধান দেখিতে সাদা। পাকিবার সময় নভেম্বর মাসের মধ্যভাগ। ফলন বিঘাপ্রতি ১০/ মণ। হুগলী জেলায় ইহার চাষ হয়।

শালধলি—উচ্চ জমির আমন ধান। ধান ঈষৎ 'হরিদ্রা-বর্ণ ও বেঁটে। রং ঝিঙ্গেশাল ধানের মত। চাউল সাদা ও মোটা, দেখিতে পাটনাই চাউলের ন্যায়। ফলন বিঘাপ্রতি ১০/ মণ। পাকে নভেম্বর মাসের শেষভাগে। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় উচ্চ জমিতে ইহার চাষ হয়।

রূপশাল—উচ্চ জমির ধান। শ্বেত ও হরিদ্রা মিশ্রিত রংয়ের ধান। ধান দেখিতে সরু ও অগ্রভাগ ধারাল। ফলন বিঘা প্রতি ১০/ মণ। পাকে ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে। চাউল বাঁকতুলসীর তুল্য। হুগলী, হাওড়া, ও বর্দ্ধমান জেলায় এবং বীরভূমের কতক অংশে ইহার চাষ হয়।

লতামউল—নিম্ন জমির ধান; লম্বা ও মোটা, গায়ে হিঙ্গুল ও হরিদ্রাবর্ণের ৬টি রেখা বিশিষ্ট। ধানের মুখ সাদা; অগ্রভাগ সামান্য কাল দাগবিশিষ্ট। চাউল সাদা ও লম্বা। এই ধানের মুড়ি ও খৈ ভাল হয়। ভাত সাদা ও মোটা। ফলন বিঘাপ্রতি ১২/ মণ। পাকে ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার ধান।

কলমকাটী—বাঁকচুরের ন্যায় লম্বা ধান ও অগ্রভাগ একটু বক্র। চাউল সাদা ও লম্বা। নাগরা অপেক্ষা অধিক দরে বিক্রয় হয়। ফসল বিঘাপ্রতি ৮।৯ মণ। খড় ভাল কিন্তু নরম। পাকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। হুগলী জেলায় ও বর্দ্ধমানের জামালপুর থানায় ইহার চাষ হয়।

শাঙ্খিমউল—উচ্চ জমির আমন ধান। আউশের পর

পাকে। ফলন বিঘাপ্রতি ৯/ মণ। চাউল সাদা ও সরু, ধানে বড় ভামা পোকা ধরে। লতামউল অপেক্ষা এই ধান গাঢ় পীতবর্ণ বিশিষ্ট। খড় নরম ও লম্বা, হুগলী ও বর্দ্ধমানের ধান ;

ওড়া—অধিক নিম্ন জমির ধান। ৬।৭ হাত জলে ধান বেশ ভাল হয়। খড় অতিশয় মোটা ও লম্বা, ধান মোটা ও বেঁটে, কতক পরিমাণে কনকচুর ধানের ন্যায়। ধানের গায়ে হরিদ্রা ও কাল ডোরা কাটা। ফলন বিঘাপ্রতি ১৫/ মণ। পাকিবার সময় ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। বর্দ্ধমানে নিম্ন জমিতে ইহার চাষ হয়। এই ধান হাজা, মজা পুকুর ও নদীতে চাষ করা বেশ ভাল চলে।

হন্নেখুড়ি—নিম্ন জমির ধান, আকৃতিতে বেঁটে, ধানের গায়ে সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের দাগ আছে, মধ্যস্থল গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ এবং উভয় কিনারা শ্বেতবর্ণ। ফলন বিঘাপ্রতি ১২/ মণ। পাকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। চাউল মোটা ও সাদা। হুগলী, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার নিম্ন জমিতে ইহার চাষ হয়।

রঘুশাল—উচ্চ জমির আমন ধান। জলে ভাল হয়। ফলন বিঘাপ্রতি ১০/ মণ। ধান দেখিতে শাঙ্কিমউল ধানের ন্যায়, চাউল সাদা ; খুব সরু নহে, অনেকটা ঝিঙ্গেশাল চাউলের ন্যায়। পাকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। এই ধান কাঠালি ধানের পর্য্যায়ভুক্ত। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে অনাবৃষ্টি হইলেও এই ধান পাকিবার কোন বিঘ্ন হয় না।

চামরমণি—নিম্ন জমির আমন ধান। খড় খুব ভাল। ফলন বিঘাপ্রতি ১২/ মণ। পাকে ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে। চাউল সাদা, দাদখানি ধানের চাউলের ন্যায় বরং তাহার চেয়েও উৎকৃষ্ট। দেখিতে দাদখানির ন্যায় একটু ফিঁকে হরিদ্রাবর্ণ। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানায় ইহার চাষ হইয়া থাকে।

শালিধান্য

ঢাকা নং ১—**ইন্দ্রশাইল**—মাঝারি রকমের রোয়া ধান, সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাকে। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের যে সকল জমি উর্ব্বর ও যাহাতে নবেম্বর পর্য্যন্ত রস থাকে সেই জমির পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা ভাওয়ালের নীচু বাইদ জমিতেই উৎকৃষ্ট ফলে। উচ্চ জমি (অর্থাৎ যেখানে কার্ত্তিক শাইল জাতীয় ধান উৎপন্ন হয়) কিম্বা দো-ফসলি জমি ইহার আবাদের উপযোগী নয়।

উপযুক্ত আবহাওয়ায় এই ধান শাইল ধান অপেক্ষা বিঘা প্রতি ১/০ মণ বেশী ফলে।

ঢাকা নং ২—**দুধসর**। প্রায় সর্ব্বপ্রকারেই এই ধান উপরে লিখিত ১ নং ধানের মত, কেবলমাত্র ইহা ১নং ধান অপেক্ষা কিছু পূর্ব্বে পাকে। সুতরাং ইহা ১নং ধানের উপযোগী জমি হইতে অপেক্ষাকৃত উঁচু ও হালকা জমিতে ভাল হয় এবং অধিক ফলে।

ঢাকা নং ১৫—**ঝিঙ্গাশাইল**। ইহা ১নং ও ২নং ধান অপেক্ষা মিহি ; ইহার ডগায় সামান্য শোঁয়া আছে। একটু অবস্থায় ইহা ২নং ধানের সঙ্গে সঙ্গেই পাকে ও সমান ফলে। ১নং ও ২নং ধান অপেক্ষা ইহার চাউল ভাল। ইহার খড় অতি নরম। কাজেই অতি সহজেই এই ধানের ঝাড় শুইয়া পড়ে। ইহা ঢাকা নং ২ ও ১৫ এই দুই রকম ধানই স্থানীয় ধান অপেক্ষা সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১/০ মণ বেশী ফলে।

ঢাকা নং ১৬—**লাটিশাইল**। ইহা এক প্রকার মোটা শাইল ধান। ২নং ধানের সঙ্গে ইহাও পাকে। ১নং, ২নং ও ৩নং ধানের উপযোগী জমিতে ইহার আবাদ চলে, কিন্তু ঐ সকল জমি অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক উঁচু এবং দো-ফসলি জমিতেই ইহার ফসল ভাল হয়। ইহার গাছ লম্বা হয় না। মোটা অথচ প্রচুর ফসল পাইবার ইচ্ছা করেন এমন ব্যক্তির জন্য এই ধান অনুমোদন করা যাইতে পারে।

ঢাকা নং ২১ —শঙ্কর জাতীয় শালিধানের মধ্যে ইহা আগে পাকে ডি X আই (৩৪) নামে পরিচিত। ইহা এক জাতীয় উন্নতত ধান্য ও মাঝামাঝি জমিতে ইহা ভাল ফসল দেয়।

চুঁচুড়া নং ২—**নাগরা**। ইহা পশ্চিম নাগরা ধানেরই একটি নির্ব্বাচিত জাতি। ১নং ধানের জমিই ইহার চাষের উপযোগী। ইহার ফলনও প্রচুর।

চুঁচুড়া নং ২—**ভাসামাণিক**। ইহা পশ্চিমবঙ্গের একটি নির্ব্বাচিত জাতি। পাঁচ বছরের গড়পড়তা ফলনে ইহা চুঁচুড়া

সরকারী ক্ষেত্রের অন্যান্য সকল ধানকেই পরাস্ত করিয়াছে। সম্প্রতি ইহার সুখ্যাতি বাংলার সমস্ত জায়গায়ই শুনা যাইতেছে। গুণ ও ফলন এই দুইয়ের সমন্বয়ে ইহা আদর্শ ধান।

বাঁকুড়া নং ১—**বাদকলমকাটি** (৬৫)। ইহা বাঁকুড়া জেলায় কার্ত্তিকশাইল শ্রেণীভুক্ত বাদকমলকাটি ধান্যেরই একটি নির্ব্বাচিত জাতি। ইহা উৎকৃষ্ট ধান্য আগে পাকে। বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলে উঁচু "বাদ ভূমিতে" ইহার ফলন এত বেশী যে তথায় ইহার সমকক্ষ অন্য কোন ধান্যই নাই। এই ধান অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে কিম্বা পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকে বলিয়া এই ধান কাটিয়া পুনরায় এই জমিতে অবস্থাভেদে রবিফসলের চাষ করা যায়।

বরিশাল নং ১—**চিংড়িঘুষি** (৫)। বরিশালের চিংড়িঘুষি বালাম ধানের একটা উন্নত জাত। স্থানীয় বালামের জমিই ইহার চাষের উপযোগী।

বরিশাল নং ২—**ক্ষীরাজলি**। বরিশালের ক্ষীরাজলি বালামেরই একটি উন্নত জাতি। বাখারগঞ্জে ইহার চাষ ও ফলন ঠিক ৯ নং ধানের অনুরূপ।

উপরে লিখিত সকল জাতীয় ধানই ফলন ও গুণের জন্য চাষের উপযোগী। উপযুক্ত আবহাওয়ায় এই সকল ধানের ফসল অন্যান্য ধান অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে।

শস্যের বীজ সংগ্রহ করিবার সময় যদি বীজের উপর উপযুক্ত যত্ন লওয়ার অভাব হয়, তাহা হইলে জমিতে

বৎসরব্যাপী পরিশ্রম করিয়াও অনেক সময় পারিশ্রমিক পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। অনেক চাষী নির্ব্বোধের মত এক বিঘা জমিতে পনর সের হইতে আধ মণ বীজ বুনিয়াও উপযুক্ত ফল পায় না। ইহার কারণ শতকরা ৫০ ভাগ বীজই খারাপ। বীজ যদি খুব ভাল না হয়, তাহা হইলে পাঁচ সের বীজের স্থলে পনর সের বীজ বুনিয়া অযথা পয়সা ব্যয় করিয়াও উপযুক্ত ফসল পাওয়া যায় না।

বীজ ভাল না হইলে তাহার উৎপন্ন গাছও ভাল হইবে না এবং গাছ ভাল না হইলে যে তাহার ফসল ভাল জন্মিতে পারে না, একথা মানব মাত্রেই বুঝিতে পারে। সুতরাং বীজ সংগ্রহ করিবার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করাই প্রত্যেক চাষীর উচিত। বীজের উপরই গাছ বা ফসলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

বীজ সংগ্রহ করিবার সাধারণ নিয়ম—সুপক্ক ফসলই বীজের উপযুক্ত। অপরিপক্ক ফল কখনও বীজের জন্য সংগ্রহ করিবে না। যে জমিতে পোকা লাগিয়াছিল সেই জমির বীজ সংগ্রহ করা উচিৎ নয় যদি নিতান্তই সেই জমির বীজ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে উত্তমরূপে বাছিয়া পোকাশূন্য গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিবে। প্রথমে জমিতে যাইয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবে যেখানকার গাছ ভাল হইয়াছে এবং যে ফসলগুলি হৃষ্টপুষ্ট ও সুপক্ক হইয়াছে সেইখানকার গাছগুলি কাটিয়া পৃথকভাবে

রাখিবে, এবং উহা পৃথকভাবে মাড়াই করিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া তবে ভাল পাত্রে রাখিয়া দিবে, এবং যাহাতে ঘরে কোন প্রকার পোকা না লাগে সেই জন্য সতর্ক থাকিতে হইবে। ধান্যের মধ্যে যে শীষগুলি সবচেয়ে বড় ও হৃষ্টপুষ্ট এবং সুপক্ক সেই শীষগুলির অগ্রভাগের ধানগুলি উত্তম বীজ রূপে পরিগণিত হয়। উক্তভাবে বীজ রাখিতে পারিলে উত্তম বীজ পাওয়া যায়; কিন্তু নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বনে বীজ সংগ্রহ করা খুবই ব্যয়সাধ্য, সেই জন্য প্রথম পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

বীজ-বিতরণ-প্রণালী

নানা কারণে বীজ-বিতরণ-কার্য্য একটি সমস্যার কথা যথা—

(১) চাষীরা সাধারণতঃ তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরাই রাখে। প্রতি বৎসরই তাহাদিগকে বাহির হইতে বীজ আনিতে হয় না। অতএব পাটের ন্যায় বীজধানের কোন নির্দ্দিষ্ট চাহিদা নাই।

(২) চাষীরা সাধারণতঃ গুণ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে ২।৩ রকম জাতের ধান বুনিয়া থাকে। অতএব অনেক জায়গা ব্যাপিয়া কেবল একই রকমের ধান বপন করা সম্ভবপর নয়। ঐ কারণেই বীজ-ধান মিশ্রিত হইয়া যায় ও ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

(৩) পাটের বীজ অপেক্ষা ধানের বীজ দরে সস্তা ও

আকারে বড় বলিয়া দূরদেশে সরবরাহ করার খরচ পোষায় না, রেলভাড়া প্রভৃতি খরচ অনেক বেশী হইয়া পড়ে।

যদি গ্রাম্য কৃষি-সমিতি, জিলা-বোর্ড, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বা স্থানীয় মাতব্বর চাষীদের দ্বারা গ্রামে বীজক্ষেত্র (Seed Centres) স্থাপিত হয়, তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান সহজে হইতে পারে। এই সকল বীজক্ষেত্র সরকারী কৃষিক্ষেত্র হইতে বীজ লইবে এবং উহা হইতে বীজ উৎপন্ন করিয়া পর বৎসর বুনিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গোলাজাত করিয়া রাখিবে ; পরে প্রতিবেশীদিগের নিকট উহা বিক্রয় করিবে কিম্বা স্থানীয় বীজের বদলে দিবে। যদি বদলে দিতেই হয় তাহা হইলে আর গোলাজাত করিবার প্রয়োজন হয় না, একেবারে শস্য কাটিবার পর ক্ষেত্র হইতেই বিতরণ করা যাইতে পারে।

এই ব্যবস্থানুযায়ী ১৯২৫ সাল হইতে কার্য্য হইয়াছে এবং ১৯৩১-৩২ সালে এইরূপ বীজক্ষেত্রের সংখ্যা ২৪৫ উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে ১২৯টির প্রত্যেকটির আয়তন ৫/ বিঘার বেশী। এই সকল বীজক্ষেত্র হইতে ১৯৩১-৩২ সনে মোট ১৩৮১৮/ মণ আউশ ও আমন বীজ-ধান বিতরণ করা হইয়াছে।

বীজ সংরক্ষণই চাষীদের পক্ষে প্রধান সমস্যা। যে পরিমাণ বীজ স্থানীয় চাষীদের কেবল বুনিবার জন্য প্রয়োজন, সেই পরিমাণ পর বৎসর বুনিবার আগে পর্য্যন্ত গোলাজাত রাখিতে হইবে, নতুবা বীজ-ধান অন্যভাবে খরচ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সাধারণ চাষীরা ইহা করিতে পারে না। আশা করা যায় সরকারী

সমবায় বিভাগ (Co-operative Society) চাষীদের এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২।১ জায়গায় সমবায় বিভাগ স্থানীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে সরকারী বীজ তাহাদের মেম্বরদের মধ্যে বিতরণ ও পরে সমগ্র বীজ গোলাজাত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে বীজ ক্রয় করিয়া এই সর্ত্তে বিতরণ করে যে, প্রত্যেক গ্রাহক ফসল কাটিবার পর সম পরিমাণ ধান এবং উপরন্তু আরও সিকি অংশ ফেরত দিবে। ব্যাঙ্ক এই সমস্ত বীজ মজুত করিয়া পুনরায় একই সর্ত্তে পর বৎসর বিতরণ করে কিম্বা বিক্রয় করে। এইরূপ ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জ এবং রাজসাহী জেলার নওগাঁও এলাকায় আউশ ধান ও বগুড়া জেলায় আমন ধান লইয়া চলিতেছে। যতদূর সম্ভব সমবায় বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের সহযোগে বীজক্ষেত্র স্থাপিত হওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা বীজক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত বীজসমূহ পর বৎসর বপনকাল পর্য্যন্ত যাহাতে গোলাজাত থাকে, তাহার সুবন্দোবস্ত নিকটবর্ত্তী ব্যাঙ্ক সমূহের সাহায্যে করাইয়া দিতে পারিবেন।

উপরে লিখিত বিভিন্ন জাতীয় ধান সম্বন্ধে কিম্বা সরবরাহের নিমিত্ত বীজ উৎপন্ন করা সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ বিবরণ জানিতে চান, তাহা হইলে ঢাকায় বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট কিম্বা সরকারী কৃষি-ফারমে উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে পারেন।

গম (Triticum Vulgore)

১। দাহ্যগুণ

শ্বেতসার ও শর্করা·	শতকরা···৬৭ ভাগ		
তৈল	”	”	১৷৷০
সূত্র	”	”	১৷৷০

২। মেদকারিতাগুণ

প্রোটিন্	”	৮ ভাগ
ভস্ম	”	২ ”
(৩) জল	”	২০ ভাগ

গম আমাদের একটি প্রধান খাদ্য। ভারতবর্ষের বহু স্থানে ও অন্যান্য দেশে বাংলার চাউলের ন্যায় গম সর্ব্বপ্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের শরীর ধারণ করিতে যে পরিমাণ পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশই গমে পাওয়া যায়। পাঁউরুটি লঘু পথ্য, কিন্তু চাপাটি পরিপাক করা সুকঠিন হইলেও লুচি অপেক্ষা উপকারী।

জাতিভেদ—

(৫) নরম সাদা গম, যথা—দুধিয়া

(২) শক্ত সাদা গম, যথা—বড় রহমা

(৬) নরম লাল গম, যথা—লালকা

(ঘ) শক্ত লাল গম, যথা—বাথেবী

শক্ত গমের দ্বারা পাঁউরুটি, চাপাটি ও সুজি প্রস্তুত হয়। নরম গমে সুজি হয় না। শক্ত গমের মূল্য অধিক।

জমি নির্ব্বাচন—দো-আঁশলা লাল মাটি গম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সামান্য কাঁকরযুক্ত হইলেও চলিতে পারে, তবে সেচ্ দরকার হয়। পূর্ব্ব বাংলায় কোন জমিতেই সেচ্ প্রয়োজন হইবে না। পশ্চিম বাংলায় বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূমে জমিতে সেচ্ প্রয়োজন। শীতঋতু দীর্ঘস্থায়ী হইলেও শিশিরে জলের সমভাব হয়।

সময় নির্ব্বাচন—কার্ত্তিকের শেষ সপ্তাহ হইতে পুরা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বোনা যাইতে পারে। সকল ফসলই অগ্রিম লাগান ভাল। (কৃষকেরা আগতী বলে)

জমি প্রস্তুত করণ—আউস ধানের ন্যায় গমের চাষেও জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতঃ চাষ দিয়া ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বুনিবার পূর্ব্বে এক মাসে তিনবার চাষ করিয়া সার দিলে ভাল হয়। বিঘাপ্রতি ⁄৯ সের বীজ বপন করিবে। বপন করিবার পূর্ব্বে বীজগুলি ১২ ঘণ্টা তুঁতের জলে ভিজাইয়া লইবে। একভাগ জলে ২ ভাগ তুঁতে দিলে জল প্রস্তুত হইবে।

সার কথন—গমের জমিতে বিঘাপ্রতি ৬ পাউণ্ড সোরা-জান বা ১৪ পাউণ্ড সলফেট এমোনিয়া দিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

কৃষকের পক্ষে বিঘাপ্রতি ১⁄ মণ হাড়ের গুঁড়া ও ।০

দশসের সোরা অথবা ১৴ মণ চিনাবাদামের খোসা ও এক গাড়ী গোবর দিলেই চলিবে। পলিপড়া মাটিতে কোন সারেরই দরকার হইবে না, তবে আশ্বিন মাসে ধঞ্চে গাছ বুনিয়া অগ্রহায়ণ মাসে ঐ গাছগুলি সমেত জমি চাষ করিয়া গম বপন করিলে বেশ ভাল ফল পাইবে।

বীজ কথন—বাংলার মাটিতে পুষা গম উৎকৃষ্ট হইবে। প্রতি জেলার কৃষি অফিসে পুষা গমে ৬, ৭, ৮, ৯. ১০, ১১, ১২ নং বীজ পাওয়া যায়। ৮নং পুষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। বিহার ও পাটনার বীজে বাংলায় বিঘাপ্রতি ৩৴ মণের বেশী ফল পাওয়া যায় না; কিন্তু পুষা গমে ৪৷৷ মণ পর্য্যন্ত ফসল পাওয়া গিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে বুনিলে চৈত্র মাসে গম পরিপক্ক হয়। পূর্ণ ৪ মাস জমিতে থাকে, বৃষ্টি না হইলে মাসে ২ বার জল সেচ্ দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

গম উৎপন্ন সামগ্রী বা শিল্প—(১) ময়দা (২) আটা (৩) সুজি।

গম পিষিয়া কাপড়ে বা সরু চালুনীতে ছাঁকিলে যে মিহি গমচূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ময়দা বলে। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহার চোকর বাদ দিলে আটা থাকে। মোটা আটাই সুজি।

গম পিষিয়া ময়দা বা চোকর বাদ না দিলে তাহাকেও আটা বলে। যে আটার চোকর বাদ না দেওয়া হয়, সুস্থ ব্যক্তির রুটির পক্ষে তাহাই উৎকৃষ্ট।

ভারতবর্ষ হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ৫/ মণ করিয়া গম বিদেশে যাইতেছে। আজকাল যেমন চারিদিকে ময়দার কল দেখিতে পাওয়া যায়, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। তখন গমগুলি যাতায় গুঁড়া করিয়া ময়দা করা হইত। তখন আটা ও সুজিতে কোন ভেজাল ছিল না। আজ রোলার মিলের গুণে মিহি ময়দা হইতেছে বটে, কিন্তু সোপষ্টোনে মিশ্রিত ভেজাল ময়দা খাইয়া ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় লোক ভুগিতেছে। গম পক্কই ভাল, আমাদের দেশের গম অধিকাংশই নরম জাতীয়, এজন্য বিদেশী বাজারে আমাদের গমের দাম কম। রুশিয়া আজ জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গম প্রদান করিয়া বেশী টাকা পাইতেছে। আমাদের কৃষকেরা যাহাতে উৎকৃষ্ট শক্ত গম উৎপন্ন করিতে পারে সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

বিশেষ করিয়া ধরিতে গেলে পূর্ব্বে ইউরোপীয় ময়দার ব্যবসায়ীরাও নরম ও শক্ত দানার পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিল না। যাহা শীঘ্র পেষা যাইত বা যাহাতে বেশ সাদা ময়দা ও বড় বড় রুটি পাওয়া যাইত, সেই গোধূম উহারা এতদিন খরিদ করিত। বর্ত্তমানে আর সেই মামুলী প্রথা নাই। আজকাল শক্ত গোধূমের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই শক্ত গোধূম কি তাহা নিম্নে বুঝাইতেছি—

শক্ত গোধূম বা গমের শক্তির অর্থ এই যে, গোধূমে বেশী সোরাজান্ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে গমে সোরাজান যত বেশী তাহার ময়দায় তত বড় রুটি হয়। এতদ্ভিন্ন

শক্ত গমে খুব সূক্ষ্ম (Fine) ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের এতদিন ধারণা ছিল যে, ভারতীয় গোধূম মাত্রই নরম এবং উহা হইতে সূক্ষ্ম (Fine) ময়দা হইবে না। ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাবেই গমের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং পাঞ্জাব হইতেই প্রতি বর্ষে ৮০ কোটী মণ গম বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। সুতরাং মণ প্রতি /০ এক আনা দাম বেশী হইলে কত অধিক আয় হইতে পারে। অথচ বিদেশে ভারতীয় গম অপেক্ষা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ার গম অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এই বিষয়ের প্রকৃত কারণ কি তাহা নির্ণয় করিবার জন্য গত ১৯০৯ সালে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে পাঞ্জাব প্রদেশের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডীয় কলওয়ালাদের সম্মিলনীর নিকট এই তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্য এক পত্র লেখেন। ঐ পত্রের উত্তরে ১৯০৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে তাহারা পাঞ্জাবের ডিরেক্টরকে লিখিতেছেন যে, ভারতীয় গোধূম সম্বন্ধে Mr. A. E. Humphrise এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধের সার অংশ এবং সভাপতির নোট পত্রে আছে। হাম্‌ফ্রি সাহেব বলেন যে, "তিনি ভারতীয় যে সকল গমের নমুনা পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে যেগুলি পেষণ কার্য্যে উত্তম চুর্ণ না হইয়া রেশমি সূত্রবৎ ময়দা উৎপন্ন করে, তাহা উত্তম শ্রেণীর গোধূম হইতে পারে না। যে গোধূম উত্তম চুর্ণ হয়, উজ্জ্বল, শ্বেত ও সূক্ষ্ম ময়দা উৎপাদন করে এবং যাহাতে

সোরাজানের অংশ অপেক্ষাকৃত অধিক সেই গোধূম উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষে এখন যে সকল লাল গোধূম উৎপন্ন হয় এবং জাভা দেশের লোকেরা যাহা নিজেদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করে তাহা প্রায় সমস্তই শক্ত গোধূম। অবশ্য লাল গম অপেক্ষা সাদা গমের দাম বেশী। নরম ও শ্বেত গম, লাল শক্ত গম ভাল, সুতরাং বর্ত্তমানে ভারতীয় গম চাষের এইটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত যে, কি প্রকারে শ্বেত উত্তম ও শক্ত গম পর্য্যাপ্ত পরিমাণ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। যেহেতু উৎপন্ন গমের মূল্যের আধিক্যই যখন প্রথম লক্ষ্যের বিষয় তখন আমরা যে জমিতেই গম চাষ করি না কেন, আমাদের শ্বেত সোরাজান বিশিষ্ট শক্ত গমের চাষ করা কর্ত্তব্য।

এই বিষয় পুষা কৃষি কলেজে ও কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পুষাতে এমন কয়েক প্রকার গোধূম উৎপাদন করা হইয়াছে, যাহাদের দানা সুন্দর, পুষ্ট, আগাগোড়া সমান, অধিকন্তু শক্ত (strong) জাতীয়। কয়েকটি নমুনা হামফ্রি সাহেবের নিকট পাঠান হয়। ইহাদের নম্বর অনুযায়ী নাম হইয়াছে, যথা—পুষা ৬, পুষা ৭, পুষা ৮, পুষা ১০ পুষা ১১ ও পুষা ১২। ইহাদের পুষা ৮ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোধূম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহা শক্ত; ইহার ময়দা অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে যে রুটি হয় তাহা সাদা। পুষা ৮নং উৎকৃষ্ট গম প্রায় আমেরিকার গমের সমান। তাহার পর পুষা ১২, ১১ ও ১০ যথাক্রমে উন্নত ধরণের গম।

কোন কোন কৃষি বিশেষজ্ঞ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে উৎকৃষ্ট বীজ আনাইয়া ভারতে চাষ করিতে বলেন, কিন্তু আমার মতে পুষা ৮, ১২, ১০, ১১ নম্বর গম চাষ করিয়া ক্রমোন্নতি দ্বারা আমরা ভাল ফল পাইতে পারি। আমেরিকার বীজ এখানকার জল বায়ু উত্তাপ সহ্য করিয়া সুন্দর ফল প্রসব করিবে কিনা সন্দেহের বিষয়। তবে পরীক্ষা হওয়া উচিত। জনসাধারণ সরকারী পরিক্ষার ফল গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবে মাত্র।

ভুট্টা (Zea Mays)

ভুট্টা একপ্রকার ওষধি পর্য্যার অন্তর্গত, কারণ ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়।

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

১।	শ্বেতসার বা শর্করা	৭১½ ভাগ
	তৈলাংশ	৫ ভাগ
	সূত্র	১½ ভাগ
	জল	২২
২।	মেদকারিতাগুণ	
	প্রোটিন্ শতকরা	৯½
	ভস্ম	১¾

(ক) ভুট্টার শস্যে জল, ছাই, আনবিউমিনিয়স, বার্ক বাইড্রেড, আশ চর্ব্বি প্রভৃতি তেজস্কর পদার্থ আছে।

(খ) দানার আবরণ—পটাশ, সোডা, লবণ, চুণ, অক্সাইড অব্ আয়রণ, ম্যাগনিসিয়া, সালফিউরিক্ অ্যাসিড্, ফস্ফরাসিক অ্যাসিড্ ও বালুকা আছে।

(গ) ভুট্টার পাতা ও ডাঁটায়—পটাস, সোডা, লবণ, চুণ, ম্যাগনেসিয়া, অক্সাইড্ অব্ আয়রণ, সালফিউরিক্ অ্যাসিড কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ ও বালুকা আছে। ফলতঃ গমে যে সকল পুষ্টিকর পদার্থ আছে, তাহার অধিকাংশই ভুট্টায় দেখা যায়। বিশেষতঃ মনুষ্য ও পশুগণের জীবন ধারণে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক ভুট্টায় প্রায় সে সকলই আছে। আমেরিকায় ইহা গমের ন্যায় আদরের সহিত ব্যবহৃত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে ধান ও গম এই দুই শস্যের পরই ভুট্টার চাষ হইয়া থাকে।

জন্মস্থান—আমেরিকায় ক্যানডা হইতে প্যাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ফ্রান্স, ইটালী, ভূমধ্যসাগরস্থ উপকূল সমূহে, হাঙ্গারী, তুরস্ক, গ্রীক, এসিয়া মাইনর, পারস্য, মধ্য এসিয়া, চীন, সিংহল প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই ভূট্টার প্রচুর আবাদ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশেও ২০০০০০ একর জমিতে ইহার আবাদ হইয়া থাকে।

আকৃতি—ভুট্টার গাছের সহিত আকের গাছের সাদৃশ্য

থাকায় উদ্ভিদতত্ত্বে ইহারা এক জাতীয় বলিয়া উল্লেখ আছে। আকের মত ইহার পাক হয়, ইহার অগ্রভাগের প্রতি পাকে, প্রতি গ্রন্থিতে পুষ্পোদ্গম হয়। কিন্তু আকের তাহা হয় না।

জমি নির্ব্বাচন—সরস, উর্ব্বর, ক্ষারযুক্ত দোয়াশ মৃত্তিকায় ভুট্টা ভাল জন্মে। আলু তুলিবার পর এবং আক কাটিবার পর ঐ জমিতে ভুট্টা দেওয়া যাইতে পারে ; অর্থাৎ আলু, আক ও আউস ধানের জমিতে ভুট্টা হয়।

সময় নির্দ্ধারণ—চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই ভুট্টার বীজ বপন করা যায়, তবে উঁচু জমিতে আষাঢ় পর্য্যন্ত বপন বা রোপণ করা চলে। যত্ন করিলে বারমাসই লাগান যায়, তবে ইহা বর্ষার ফল, অন্য সময় ফলগুলি তত বড় হয় না।

চাষ কথন—চৈত্র ও বৈশাখে বৃষ্টি হইয়া গেলেই জমিতে ছয় সাতবার লাঙ্গল ও তিন চারিবার মই দিয়া তবে ভুট্টা বুনিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে উঁচু জমিতে বপন বা চারা তৈয়ারী করিয়া রোপণ চলিতে পারে। বিঘা প্রতি ৩।৪ সের বীজ প্রয়োজন। লাঙ্গলের শিরানে ১ ফুট অন্তর দুই তিনটি বীজ বপন করিতে হয়। সারিগুলি এক হাত অন্তর হওয়া উচিত। জমিতে ঘাস বা তৃণ জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে। কোদাল দ্বারা গোড়ায় আকের ক্ষেতের মত মাটি দিয়া আইল বাঁধিয়া দিতে হইবে। গাছ এক ফুট ছোট থাকিতে এই কাজ করা উচিত। ভুট্টার ক্ষেতে হাত কোদালই প্রকৃষ্ট যন্ত্র। চাষ বিস্তৃত হইলে প্লচাট বুনিয়ার ব্যবহার করা যাইতে পারে ;

ইহাতে নিড়ানের কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, ইহার দ্বারা একবারে ৮।১০ বার নিড়াইবার কাজ চলিয়া থাকে।

সার—গলিত উদ্ভিদ জাত সার, ছাই, হাড়ের গুড়া ও সোরা ভুট্টার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। বিঘাপ্রতি চাষের পূর্ব্বে এক গাড়ী গোবর কিছু ছাই মিশাইয়া ও তাহার সহিত দশ সের সোরা মিশ্রিত করিয়া দিলেই চলিবে। চিনা বাদামের খৈলও ভুট্টার উৎকৃষ্ট সার।

ফলন—বিঘাপ্রতি ৪ সের বীজ বপন করিলে ৮ মণ পর্য্যন্ত ভুট্টা হয়। যদি যত্নপূর্ব্বক ১ হাত অন্তর লাইন করিয়া চারা গাছ লাগান যায় তাহা হইলে ৮০×৮০=৬৪০০ গাছ হয়। প্রতি গাছে ৩টি হইতে ২০টা ভুট্টা হয়, কম হইলেও ১৯২০০টি ভুট্টা হইবে।

বীজ বপন—ভুট্টা নানাপ্রকারের আছে। বাংলাদেশের পক্ষে জোনপুরের ভুট্টাই ভাল, আর দার্জ্জিলিং ও আসাম প্রভৃতি স্থানের জন্য আমেরিকার বীজ উৎকৃষ্ট। যতদিন আমাদের দেশে সরকারী সাহায্যে বীজ রক্ষার জমি না হয় ততদিন বিদেশী বীজ কিনিয়া লাগান ভাল। বীজ রাখিতে হইলে খুব তেজস্কর গাছে অল্প ফল রাখিতে হয়, এবং সেই ফল সুপক্ক হইলে শুষ্ক করিয়া যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত স্থানে রাখিতে হয়।

ভুট্টার ব্যবহার—(ক) কচি কাঁচা ভুট্টা অনেকে আগুনের তাপে ঝলসাইয়া খাইতে ভালবাসে। ভাজিয়া খই করিয়া

অনেকে খাইয়া থাকে, যাঁতায় ভাঙ্গিয়া ময়দা করিয়াও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা পুষ্টিকর খাদ্য।

(খ) গো-মহিষাদির প্রিয় খাদ্য, দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ বাড়াইতে হইলে ফলসমেত কাঁচা গাছ খাইতে দিতে হয়। আমেরিকায় ভুট্টা ও ভুট্টা গাছ হইতে নানাবিধ শিল্প কার্য্য হইতেছে যথা—

ভুট্টা গাছের রসে চিনি প্রস্তুত হইতেছে, অবশিষ্ট গুড় হইতে সুরা এবং পরিত্যক্ত ছিচড়া (আঁইস) হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

এক টন আকের রস হইতে যে পরিমাণ চিনি জন্মিবে, ভুট্টাগাছের রস হইতেও সেই পরিমাণ চিনি হয়; অধিকন্তু গাছের আঁইস হইতে সোডা সংযোগে উৎকৃষ্ট কাগজের উপযোগী গুঁড়া তৈয়ারী হইবে।

শিল্প—১। ইহার ফল আবরণীর পত্র সকল শুষ্ক করিয়া তদ্দারা দড়ি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইউরোপে এই পত্রজাত সূত্র হইতে স্থুল বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পত্র হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। অষ্ট্রীয়ার অধিকাংশ কাগজই ভুট্টার পত্রজাত। এদেশে ভুট্টার পত্র অব্যবহার্য্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

২। ভুট্টা গাছ হইতে চিনি বাহির করিবার প্রথা ইক্ষু চিনি প্রস্তুত প্রথার অনুরূপ। কলকব্জা সবই এক। ইক্ষু চিনি প্রস্তুত করিতে যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি আবশ্যক

ভুট্টার জন্যও তাহাই আবশ্যক। এক টন (২০০০ পাউণ্ড) ভুট্টাগাছ হইতে অপরাপর কঠিন দ্রব্য বাদ দিয়া ২৭০ পাঃ শর্করা মিশ্রিত রস পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ২৪০ পাঃ দানাদার শর্করা, ২০ পাঃ ভুরা (Uncrystaligable Sugar) এবং ১৪ পাঃ অপরাপর পদার্থ। গড়ে ইহাতে শুকনা ১নং চিনি ১৬০ পাঃ, ২নং চিনি ৩০ পাঃ উৎপন্ন হইবে। যাহাতে প্রায় ৭০ পাঃ চিনি বিদ্যমান আছে। এরূপ ৬ গ্যালন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তাহা হইতে ৯৫ প্রুফ প্রায় ৫ গ্যালনে সুরাসার তৈয়ারী হইবে। অধিকন্তু রস নিষ্কাশিত ডাঁটার ছিবড়া হইতে ৩০০ পাঃ শুষ্ক আঁইস পাওয়া যাইবে। সে আঁইস হইতে ২০০ পাঃ কাগজ প্রস্তুত উপযোগী গুঁড়া উৎপন্ন হইবে।

৩। ভুট্টা গাছের শীষ (ears) কচি অবস্থায় তুলিয়া ফেলিলে গাছের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়; এইরূপে ইহাদের দীর্ঘজীবন দান করিতে পারিলে, ইহাদের শারীরিক গঠনের পরিবর্ত্তন হয়, এবং সেই সঙ্গে ইহাদের আয়তন, গুরুত্ব ও রসে শর্করার পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। এই সময়ে ইহাদের রস খুব পরিষ্কার থাকে। একটন কচি শীষ হইতে এমন ২১০ পাঃ রস উৎপন্ন হইবে যে রস হইতে ৩১ গ্যালন প্রুফ সুরাসার জন্মায় এবং ৮৫ পাঃ শুষ্ক গুঁড়া পাওয়া যায়; ইহাতে কাগজ হইবে।

৪। ভুট্টার পাকা দানা হইতে বিলাতে মদ তৈয়ারী

হয়। কাঁচা ও কচি দানা হইতে মদ তৈয়ারী করিলে সুরাসারের পরিমাণ অনেক বাড়ে এবং তৈয়ারী করার খরচও কম হয়।

যব (Hordium Vulgare)

ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই যব অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে গম, ছোলা, মটর ও মসূর প্রভৃতি শস্যের সহিত যব বপন করা হইয়া থাকে, কোথাও কোথাও পৃথক্ ভাবে বপন করা হয়। উর্ব্বর জমিতে গম এবং গম ও যব দুইই কখন জন্মিয়া থাকে। গম অপেক্ষা যব বীজ একটু পূর্ব্বে বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি যব ।৫ পনর সের আবশ্যক। বীজ খুব ভাল হইলে ।০ দশ সেরেও চলিতে পারে। যবের জমিতে গমের ন্যায় নিড়ান সেচ আবশ্যক করে না। ইহাতে গম অপেক্ষা পোকাও কম ধরিয়া থাকে।

সার—বিঘা প্রতি এক গাড়ী পচা গোবর অথবা চারাগুলি ৬ ইঞ্চি লম্বা হইলে ।২ সের সোরা ছড়াইয়া শেচ দিলে ভাল হয়।

কাটা ও মাড়াই—শস্যগুলি পাকিয়া উঠিলে কাটিবে। ২।৩ দিন ক্ষেতে ফেলিয়া রাখিবে। পরে বাড়ীতে বা খামারে

আনিয়া মাড়িয়া বীজ ও গাছ আলাদা করিয়া শস্য গোলা-জাত করিবে।

এক বিঘা জমিতে কত ব্যয় ও আয়

ব্যয়		আয়	
৩।৪ বার চাষ ও মৈ দেওয়া	=২৷৷০	৬/০ যবের দাম × ৫	=৩০৲
বিঘা দশ সের	১৷৷০	খড়	২৲
কাটাই মাড়াই	২৷৷০	মোট আয়	৩২৲
।২ = ১২সের সোরার দাম	২৷৷০		বাদ—১০৲
খাজনা ও মাসের জন্য	১৲		
দশ টাকা	১০৲	নেট আয়	২২৲

যব হইতে বিয়ার মদ প্রস্তুত হয় বলিয়া এ দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে যব চালান যায়। আমরা যবের ছাতু খাইয়া থাকি। রবিন্ সন্স্ বার্লি যবের ছাতু হইতে প্রস্তুত।

যই (Avena Sativa)

যই—বাংলায় যই খুব কম জমিতে চাষ হইয়া থাকে। এদেশের আউশ ধানের জমিতে ইহার চাষ হইতে পারে। আউশ ধান ও পাট কাটিবার পর উঁচু জমিতে বিঘা প্রতি কুড়ি গাড়ী গোবর সার দিয়া জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া

/৮ সের বীজ ছড়াইয়া পুনরায় চাঁষ দিয়া মই দিতে হইবে। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে এইগুলি তুঁতের জলে ভিজাইয়া লইলে পোকা ধরে না এবং গাছ ভাল হয়। যব ও গমের ন্যায় গাছ একটু বড় হইলে ।০ সের সোরা ২/ মণ জলে গুলিয়া পিচকিরি দ্বারা জমিতে ছিটাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

শস্য সংগ্রহ—ভাল করিয়া পাকিবার পূর্ব্বেই শস্য কাটিতে হইবে। বেশী পাকিলে শস্য ঝরিয়া পড়িবে এবং গাছও খারাপ হইবে। ইহার খড় ধানের খড় অপেক্ষা গরু ও ঘোড়া খাইতে বেশী পছন্দ করে। অনেক স্থানে ফলিবার পূর্ব্বে ২।১ বার আগা কাটিয়া গরুকে খাওয়ান হয়; গরু ও ঘোড়ার খাদ্যের জন্যও কোথাও কোথাও ইহার চাষ হইয়া থাকে। ৩।৪ মাসে শস্য পাকে। বিঘা প্রতি ৬/ মণ যই হয়। ইহার চাষ সাধারণতঃ দিল্লী, মিরাট, হিসার প্রভৃতি স্থানে প্রচুর হয়। যই ঘোড়ার খাদ্যের জন্য বিদেশে যায়।

পোকা—যই গাছের শীষে একপ্রকার পোকা ধরে। উহাকে ধসা পোকা বলে। (Oat smut) ওটের বীজগুলিকে ৪০% কম্যারসিয়াল্ ফারমিনাইলে ভিজাইয়া বুনিলে পোকা ধরিতে পারে না।

জোয়ার (Sorghum Vulgare)

জাতি—ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে প্রায় ৮০ লক্ষ বিঘা জমিতে জোয়ারের চাষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দুই জাতীয় জোয়ার দৃষ্ট হয়। যে জোয়ার শরৎকালে পাকে তাহাকে খারিপ এবং যাহা বসন্তকালে পাকে তাহাকে বরি জোয়ার বলে।

ভূমি—উঁচু, নীচু, উর্ব্বর ও অনুর্ব্বর সকল জমিতেই ইহা হয়। তবে বৃষ্টির জল বাঁধা জমিতে হইবে না, জল বাঁধিলে ইহা পচিয়া যায়।

চাষ—কালবৈশাখী বৃষ্টির পর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি চাষ করিয়া ও মৈ দিয়া মাটি গুঁড়া করিবার পর উভয়দিকে এক হাত অন্তর ২ ইঞ্চি মাটির তলে দানা বা বীজ পুতিতে হয়। এই বীজে শরৎকালে ফল হয়, এবং কার্ত্তিক মাসে বপন করিলে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে পাকে। বিঘা প্রতি /১ সের বীজ লাগিবে।

সার—পলি পড়া মাটিতে সারের দরকার নাই। পশ্চিম বাংলায় বিঘা প্রতি ২০ গাড়ী গোবর সার দিতে হইবে বা ধঞ্চে সার দিয়া লাগাইবে।

পোকা—জোয়ার গাছে প্রায়ই "ধসা পোকা" লাগে। বীজগুলি তুতের জলে বা ফারমিনাইলে ডুবাইয়া বপন করিলে পোকার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যেখানে পোকার উৎপাত বেশী তথায় কার্ত্তিক মাসে লাগাইলে শীতে ঐ পোকা

তত বেশী হয় না। পোকার হাত হইতে রক্ষা করিলে বিঘা প্রতি ২/০ মণ হইতে ২৷৷০ মণ পর্য্যন্ত বীজ হয়। ইহাও পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

বাজ্‌রা

বাজ্‌রার রুটি, ছাতু ও খৈ হয়। গরীব লোকেরা ইহা খায়, এবং পশুর খাদ্যরূপে গাছ ও শস্য ব্যবহৃত হয়।

আষাঢ় মাসের প্রথমেই ইহা বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩/০ সের বীজ দরকার। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ইহা পাকে। বিঘা প্রতি ২/০ মণ ফসল হয়। শুষ্ক বালুকাময় জমিতে ইহা জন্মে।

শ্যামা

ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি /৸০ পোয়া বীজ দরকার। ফলন বিঘাপ্রতি ২/০ মণ হয়। সেচ বা সারের দরকার হয় না। ইহাও পশুর খাদ্য, তবে ইহার দানা দ্বারা গরীবেরা খৈ করিয়া খায়।

কোদো

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগে বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি /৸০ পোয়া বীজ আবশ্যক। আশ্বিন মাসে পাকে। বিঘা প্রতি ৩/০ হয়। কোদো জঙ্গলময় ও নীরস বালুকাময় জমিতেও ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার শস্যে মাদকতা শক্তি আছে।

চিনা

ফাল্গুন চৈত্রে বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি /৩ সের বীজ দরকার। ইহা আশ্বিন কার্ত্তিকে পাকে। বিঘা প্রতি ৩/ মণ ফসল হয়। কার্ত্তিক মাসে বুনিলে ফাল্গুন চৈত্রে পাকে। ইহার চাউল অতি সুন্দর, উৎকৃষ্ট পায়স হয়। বাংলার পাবনা জেলায় নানাস্থানে ইহা হইয়া থাকে।

মটর (Pisum Sativum)

মটর দ্বিদল বীজ। এই গাছের ডালে ডালে শুঁটির মধ্যে মটর হয়। ইহা লতা জাতীয় গাছ।

মটরকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—বিলাতী ও দেশী। বিলাতী মটর আকারে বড়, এবং দেশী মটর আকারে ছোট হয়। ছোট দেশী মটরকে কোথাও কোথাও পায়রা মটর বলে। আর এক রকম বড় মটর আছে তাহাকে কাবুলী মটর বলে। কাবুলী মটর দেখিতে সাদা ও আকৃতি বড়। ইহার ডাইল আকৃতিতে বড়, দেখিতে ছোলার ডাইলের মত।

বীজের পরিমাণ ও বপন সময়—কাবুলী মটর বা বড় দানা বিঘা প্রতি /৭ সের, পায়রা মটর ছোট দানা বিঘা প্রতি

/৫ সের বপন করিতে হয়। স্থানভেদে উঁচু জমিতে আশ্বিন কার্ত্তিক এবং নীচু জমিতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত মটরের বীজ বোনা যায়। সাধারণতঃ পৌষ মাঘ মাসে শুঁটি ধরে। চৈত্র মাসে ফল পাকিয়া উঠে ও লতা শুকাইতে আরম্ভ করে। মটর গাছ প্রতি বৎসর ফল ধারণের পর মরিয়া যায়। শুঁটি বিক্রয় করিতে হইলে আশ্বিন মাসে বীজ বোনাই শ্রেষ্ঠ।

জমি নির্ব্বাচন ও চাষ—সারযুক্ত দোআঁশলা বা পলিপড়া মাটি হইতে জল সরিয়া গেলে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। উঁচু জমিতে ৩ বার চাষ দিয়া মৈ দিয়া মাটি সমান করতঃ বীজ ছড়াইয়া পুনরায় মৈ দিতে হয়।

ফলন—বিঘা প্রতি ৮/ মণ হইতে ১০/ মণ পর্য্যন্ত মটর হইয়া থাকে। শুঁটি বিক্রয়ে বেশী লাভ ; গাছগুলি গরুর খাদ্য। মটরের শুঁটি বিক্রয় করিতে পারিলে বিঘা প্রতি ২৫৲ টাকা, এবং মটর বিক্রয় করিলে বিঘা প্রতি নেট ১৫৲ টাকা লাভ হয়।

সায়াবিন

ইহা মটর জাতীয়, কিন্তু লতান নহে—গুল্ম। যেখানে জল না দাঁড়ায় এইরূপ দোআঁশলা সারযুক্ত মাটিতে ইহার চাষ করিতে হয়। বাংলার সর্ব্বত্রই সয়াবিনের চাষ হইতে পারে, বিশেষতঃ উত্তর ও পশ্চিমাংশের জমি সয়াবিন চাষের বিশেষ উপযোগী। গোপালগঞ্জে এক মিশন ৬/০ বিঘা জমিতে সয়াবিন চাষ করিয়া একটি স্কুল চালাইতেছেন।

চাষের সময়—আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে নিম্ন ভূমির জল নামিয়া গেলে পলিপড়া মাটিতে বিনা সারেই ইহা লাগান যায়। পশ্চিম বাংলার উঁচু জমিতে বিঘা প্রতি ১/ মণ রেড়ীর খইল পচা গোবর সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে উৎকৃষ্ট ফলন হইবে।

বীজের পরিমাণ—বিঘা প্রতি /২॥ সের বীজ প্রয়োজন। দেড় হাত অন্তর একটি করিয়া বীজ বা দানা পুতিবে। লাইনের দূরত্ব যেন দুই হাত হয়। গাছ খুব ঘন হইলে ফল ভাল হয় না, একটি গাছের গায়ে যেন আর একটি গাছ না লাগে। এক বিঘা জমির চাষের সর্ব্বসমেত খরচ ৩০৲ টাকা, ফল বিক্রয় করিলে বিঘা প্রতি ১০০৲ হইবে। খরচ বাদে প্রতি বিঘা জমিতে ৭০৲ লাভ থাকিবে। পতিত জমিতে এই চাষ করিলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা কিছু উন্নত হয়। এই বীজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যরূপে ডাক্তারগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে আটা, ডাইল, তরকারী, সয়ার দুগ্ধ ও বিস্কুট ইত্যাদি হয়।

মুগ

সাধারণ বিবরণ—কলাইএর মধ্যে মুগই প্রধান। মুগ কলাই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ;—(ক) কৃষ্ণমুগ (খ) সোনামুগ। কৃষ্ণমুগ দেখিতে কালো, আকারে সোনামুগ অপেক্ষা বড়। সোনামুগ আবার তিনভাগে বিভক্ত, যথা,—সোনামুগ,

ঘোড়ামুগ ও ঘেসোমুগ। সোনামুগের ডাল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত। ঘোড়ামুগ ও ঘোসোমুগ দেখিতে সোনামুগের ন্যায় কিন্তু আকৃতি একটু লম্বা ও সামান্য সবুজ আভাযুক্ত। সোনামুগ আকৃতিতে একটু ছোট, দেখিতে পীতাভ। বাজারে ঘোড়ামুগ ও ঘেসোমুগ, সোনামুগ বলিয়াই বিক্রয় হয়। এই বর্ণনা মনে রাখিলে বাজারে কিনিবার সময় ঠকিতে হইবে না।

বপন সময়—হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় আশ্বিন মাসে এবং নিম্ন বঙ্গে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বোনা হয়। কিন্তু যুক্ত ও মধ্যপ্রদেশে আষাঢ় মাসে বোনা হইয়া থাকে।

চাষ—তৃণহীন উঁচু জমিতে ৩।৪টি চাষ দিয়া ও মাটি উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া বিঘা প্রতি /৫ সের কৃষ্ণমুগ এবং /৪ সের সোনামুগ বুনিতে হয়। পচা গোবর সারই উৎকৃষ্ট সার। নদীর তীরবর্ত্তী পলিপড়া মাটিতে সার দরকার নাই।

ফলন—এক বিঘা জমিতে সোনামুগ ৩/ মণ এবং কৃষ্ণমুগ ৪/ মণ হইয়া থাকে। বপনের কিছুদিন পরে এক পসলা বৃষ্টি পাইলে ভাল ফসল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুগ জ্বর রোগীর পথ্য। রোগীর পক্ষে ঘোড়ামুগ সোনামুগ হইতে উপকারী। মুগের ডাইল খাইলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মুগের ডালের বেসম হয়। তদ্বারা পাঁপড় হয়। মুগের ডালের বেসমে সাবান অপেক্ষা ভালভাবে গাত্র পরিষ্কার হয়, ইহাতে ত্বক নরম ও পরিষ্কার থাকে।

মসূর (Lens Esculenta)

সাধারণ বিবরণ—মসূর ভারতবর্ষের অনেক স্থানে চাষ হইয়া থাকে। মধ্যভারত ও মাদ্রাজে ইহার চাষ অধিক। পাঞ্জাবে ২৪০০ একর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ১৬০০০০ একর জমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। মধ্যভারতে নর্ম্মদা নদীর উপত্যকায় সাতপুর এবং ছত্রিশগড় জেলায় অতি উত্তম মসূর হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে পাবনা জেলার দানা বড় হয়, কিন্তু বরিশালের মসূরের ডালের স্বাদ অতি সুন্দর ও মিষ্ট। বাংলার সকল জেলাতেই কিছু কিছু মসূরের চাষ হইয়া থাকে। পশ্চিম বাংলার উচু জমিতে এবং পূর্ব্ব বাংলার নীচু জমিতে মসূর মাটির উপর ছিটাইয়া বোনা হয়। সারহীন জমিতে মসূর ভাল হয় না। প্রতি জেলায়ই বুনিবার সময়ের কিছু তারতম্য আছে। স্থানবিশেষে আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বোনা হইয়া থাকে।

চাষ ও বীজের পরিমাণ—আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মসূর বপনের সময়। তবে যত শীঘ্র বোনা যায়, ততই ভাল ফসল হয়। এক বিঘা জমিতে ৫।৬ সের বীজ লাগে। ৪।৫ বার লাঙ্গল দিয়া মাটি গুঁড়া করিয়া তৃণহীন জমিতে বীজ বুনিয়া মই দিতে হয়। মসূর ডালের জমি একটু রসাল না হইলে ফসল ভাল হয় না। পাবনা ও বরিশালের পলি মাটিতে এই কারণে উৎকৃষ্ট মসূর হইয়া থাকে।

ছোলা (Cicer orictinum)

সাধারণ বিবরণ—ছোলা ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে চাষ হইয়া আসিতেছে। পুরাণাদিতে অনেক স্থানে ছোলার উল্লেখ আছে। ভারতে মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বিঘা জমিতে ছোলার চাষ হইতেছে। অযোধ্যা, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মধ্যভারত. মহীশূর, বেরার, মাদ্রাজ, ব্রহ্মদেশ, গোয়ালিয়র ও বাংলা প্রভৃতি স্থানে ছোলার চাষ হয়।

জাতি—ছোলা সাধারনতঃ তিন জাতীয় দেখা যায়, যথা—দেশী, কাবুলী ও পাটনাই। দেশী ছোলা আকারে ছোট, কাবুলী ও পাটনাই অপেক্ষাকৃত বড়।

বীজের পরিমাণ—বিঘা প্রতি দেশী ছোলার বীজ দশ সের, পাটনাই ।১ এগার সের, কাবুলী ।২ সের বীজ দরকার হয়। বর্ষার বৃষ্টি বন্ধ হইলে আশ্বিনের শেষ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ইহা বোনা যাইবে।

জমি ও চাষ—দোআঁশলা বা নদীর পলিপড়া মাটি উৎকৃষ্ট। ছোলা বুনিবার সময় জমিতে রস থাকা চাই। সেচ দেওয়া আবশ্যক নাই, তবে জমির মাটি আলগা না থাকিলে শিশির প্রবেশ করিতে পারে না। শিশির প্রবেশ করিতে না পারিলে গাছ ভাল বাড়ে না। ছোলার জমিতে মটরের ন্যায় সার দিতে হয়। ইহার চাষের বিবরণ পৃথক আবশ্যক করে না,

ঠিক মটরের ন্যায় চাষ। যেঁ জমিতে চূণের ভাগ বেশী আছে, তাহাতে ছোলা ভাল জন্মে। বুনিবার পর অধিক বৃষ্টি হইলে, কিম্বা স্থুটি ধরিবার পর বৃষ্টি হইলে ছোলা নষ্ট হইয়া যায়। গাছ একটু বড় হইলে মাথা কাটিয়া দিলে ডালপালা বেশী হয় এবং ফল বেশী ধরে।

পাকিবার সময়—ছোলা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাকিয়া থাকে ; কেহ কেহ গাছ উপড়াইয়া বিক্রয় করে। কাঁচা ছোলা খাইতে মিষ্ট, পোড়াইয়া খাইলে আরও মিষ্ট লাগে। ফলন বিঘা প্রতি ৪/ মণ হইতে ৮/ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ব্যবহার ও গুণ—ছোলা ভারতবর্ষের অনেক দেশের প্রধান খাদ্য। ইহা গো, মহিষ, ঘোটকের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ছোলা অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য, ইহার ছাতু খাইয়া অনেকে দিন কাটায়। ছোলা গাছের উপর পরিষ্কার কাপড় বিছাইয়া দিলে রাত্রিকালে যে শিশির পড়ে, উহা খাইতে অম্লরস বিশিষ্ট। কবিরাজী শাস্ত্রে এই শিশিরের জল অম্লরোগ নিবারক।

অড়হর (Cajanus Indicus)

কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে অড়হর গাছের বর্ণনা দেখা যায় ; ইহাতে বোঝা যায় অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে ইহার চাষ হইয়া আসিতেছে। ১৬৮৬ অব্দে মালাবার

উপকূলখণ্ডে ইহার বিস্তৃত চাষ হয়। সাদা ও লাল দুই রকম অড়হর বোম্বাই প্রদেশে চাষ হয়, এবং পরে তথা হইতে ভাল বীজ ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

উৎপত্তি স্থান—অড়হর বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ, মহীশূর, বেরার, রাজপুতনা, মধ্যভারত, বঙ্গদেশ ও আসামে চাষ হয়।

চাষ প্রণালী—"ধন্য রাজার পুণ্যদেশ,
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।"

মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে অড়হরের জমিতে ৩।৫ বার চাষ দিয়া মাটি আল্‌গা ও তৃণহীন করিতে হইবে। পরে কালবৈশাখীর প্রথম বৃষ্টিতেই বিঘা প্রতি /৫ সের বীজ বুনিয়া চাষ ও মই দিতে হইবে। কিন্তু যদি ২ হাত অন্তর ২।১টি করিয়া বীজ দেওয়া হয়, তবে মাত্র /১৷৹ সের বীজ লাগিবে। গাছ পাতলা হইলে ফল বেশী হইবে। গাছ এক হাত উচু হইলে আইল বাঁধিয়া দিলে গাছ ভাল হয়। সমতল ভূমি অপেক্ষা আইলের গাছ ভাল হয়। বর্ষায় অড়হর গাছের জল নিকাশের বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। অড়হর ও ভুট্টা একসঙ্গে বোনা চলে। ভুট্টা পাকিয়া গেলে অড়হর গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যে অড়হর বোনা হয়, তাহাকে মাঘী এবং আষাঢ় মাসে বোনা অড়হরকে চৈতালী অড়হর বলে। শেষোক্ত অড়হর মাদ্রাজে বেশী চাষ হয়। অড়হর বাংলা দেশে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাকিয়া থাকে। জমির উর্ব্বরতা অনুযায়ী ৭/ মণ

হইতে ১০/ মণ পর্য্যন্ত ফলন হইয়া থাকে। পাটনাই অড়হর দেশী অড়হর অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে এবং আস্বাদও ভাল। বাংলাদেশের মাটির পক্ষে কুমিল্লার অড়হরই শ্রেষ্ঠ। একবার লাগাইলে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে।

পোকা—অড়হর গাছে একরূপ পোকা ধরিয়া সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া দেয়। গাছগুলি ছোট থাকিতে প্রজাপতি গাছের গায়ে ডিম পাড়ে; সেই ডিম হইতে যে পোকা হয় তাহা গাছের ভিতর প্রবেশ করিয়া গাছের রস খায়। সুটি ধরিলে সেই পোকাই তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া ফল নষ্ট করিয়া দেয়। যে জমিতে অড়হর হইয়াছে, অড়হর পাকার পর গাছগুলি ঐ জমিতে পোড়াইয়া দিলে এবং পতিত রাখিলে, অথবা অড়হরের সহিত ভুট্টার গাছ লাগাইলে পোকার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

অড়হর গাছে গালা—উত্তরবঙ্গে ও আসামে গালা চাষের জন্য অড়হর চাষ করা হয়। তথাকার চাষীরা গালার পোকা অড়হর গাছে ছড়াইয়া দেয়। পোকাগুলি বংশ বিস্তার করিতে করিতে সকল গাছেই ছড়াইয়া পড়ে। গালার জন্য চাষ করিতে হইলে কুমিল্লার অড়হরই শ্রেষ্ঠ, কেননা তিন বৎসর গাছগুলি জীবিত থাকে। গালার জন্য লাগাইতে হইলে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া এবং প্রত্যেক ৪ হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে একটি বা দুইটি করিয়া প্রতি গর্ত্তে বীজ দিবে। (৮০ হাত প্রস্থ ৮০ হাত

দীর্ঘ বাংলায় এক বিঘা) ৪ হাত অন্তর গর্ত্ত করিলে ২০টি লাইন হইবে। ২০ X ২০ = ৪০০ শত গর্ত্তে ৪০০ গাছ রাখিবে। বর্ষা অন্তে আশ্বিন কার্ত্তিকে গাছে লাক্ষার বীজ লাগাইবে।

(লাক্ষা চাষ দ্রষ্টব্য)

বিরী বা মাষকলাই

সাধারণ বিবরণ—মাষকলাই ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। ভারতে ১৫ রকম মাষকলাইর চাষ আছে। ইহা বাংলার সমতল ভূমিতে প্রচুর জন্মে। আউশ ধান কাটিয়া দুইটি চাষ দিয়া বীজ ছড়াইয়া একবার চাষ ও মই দিলেই যথেষ্ট হইবে। খনার মতে ভাদ্র মাসের '২০ তারিখের পর আশ্বিনের ১৯ তারিখের মধ্যে কলাই চাষের উৎকৃষ্ট সময়, যথা—

"ভাদ্রের উনিশ
আশ্বিনের উনিশ
যত পারিস্ কলাই বুনিস্।"

সাধারণতঃ হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার নিম্ন ভূমিতে ভাদ্র মাসে এবং সাঁওতাল পরগণা ও পার্ব্বত্য স্থানে আষাঢ়-শ্রাবণে কলাই বুনিয়া থাকে।

বীজের পরিমাণ ও উৎপন্ন ফসল—এক বিঘা জমিতে/৫ সের বীজ আবশ্যক। ভাল ফসল হইলে ৩/ মণ হইতে ৪/ মণ

পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বীরভূম, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর এই চারি জেলায় ইহার ডালের প্রচলন বেশী। হাওড়া-হুগলী, ২৪ পরগণায় কিছু কিছু ব্যবহার হয়। পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণতঃ এই ডালের বড়ী তৈয়ারী হয় ও পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

বরবটী (Vigna Gatjung)

সাধারণ বিবরণ—বরবটী কলাই নানাজাতীয়; একপ্রকার বাগানে চাষ হয়, ইহার গাছ লতা জাতীয়। ইহা সুটির আকার লম্বা, বাজারে তরকারীরূপে বিক্রয় হয়। আর এক প্রকার বরবটী ক্ষেত্রে চাষ হয়। ইহার কাঁচা সুটির তরকারী বেশ ভাল হয়। সুটি পাকিলে ভিতরে মুগের ডালের ন্যায় ডাল হয়। আস্বাদ মুগের ন্যায়। বরবটীর বড়ি অতিশয় মিষ্ট।

চাষ ও বসাইবার সময়—বাগানে যে বরবটী কলাইয়ের চাষ হয়, তাহার অপর নাম রম্ভা কলাই। এই কলাই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বসাইতে হয়। যে কলাই জমিতে চাষ করিতে হয়, তাহা কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে বুনিতে হয়।

জমি—দোআঁশলা উর্ব্বরা হইলে ভাল হয়, বিঘা প্রতি /৫ সের বীজ বুনিতে হয়। ফসল বিঘাপ্রতি ২/ মণ হইতে ৩/ মণ হয়। এই বীজ দিলে জমি উর্ব্বর হইবে।

খেসারি (Lathyrus Sativus)

নিম্ন আমন জমিতে বা চর জমি হইতে জল নামিয়া গেলে বীজ ছিটাইয়া বোনা হয়। আশ্বিন-কার্ত্তিকে কাদাযুক্ত বা সর পড়া মাটিতে বিঘা প্রতি ⁄৯ সের বীজ ছিটাইয়া বোনা হয়। ইহার জন্য অপর সারের দরকার নাই, ধান্যের জন্য যে সার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই চলিবে, বা নদীর পলি যেখানে পড়িয়াছে সে জমিতেও সারের প্রয়োজন নাই।

অনেক জমিতে ধান থাকিতে থাকিতে বোনা হয়, ধান কাটিবার সময় খেসারি গাছ ছোট থাকে, চৈত্র মাসে পাকে। অনেক স্থানে কাঁচা থাকিতেই গরুকে খাওয়ায়। এই ডাল পূর্ব্ববঙ্গে বেশী হয়, পাবনা ও ফরিদপুরে সব চেয়ে বেশী জন্মে। পশ্চিম বঙ্গের অনেকের ভুল ধারণা আছে যে খেসারি ডাল খাইলে পক্ষাঘাত বা রাত অন্ধ হয়। ইহা বিলাতে রাজকীয় ডাক্তারী প্রতিষ্ঠানে ডাঃ ডান্‌ষ্টান্ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া স্থির হইয়াছে যে, খেসারি কলাইতে এমন কোন পদার্থ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে পক্ষাঘাত বা রাত অন্ধ হইতে পারে। ইহা মনুষ্য অপেক্ষা পশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

তিল্ (Sesamum indicum)

জাতি—তিল সচরাচর কাল, লাল, শ্বেত ও ধূসর বর্ণ-ভেদে চারি প্রকার। কোন কোন স্থানে ইহার গাছ এক

হাতের অধিক ঊর্দ্ধ হয় না। আবার কোন কোন স্থানে দুই হস্ত পরিমাণ উচ্চ হয়। সচরাচর ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ। আর এক প্রকার তিলের ফুল লালবর্ণ হয়। সাদা তিলের পাতা অতিশয় চওড়া ও সবুজবর্ণ। কৃষ্ণতিল অপেক্ষা সাদা তিল খাইতে মিষ্ট এবং ইহাতে তৈলের ভাগ বেশী আছে।

উৎপত্তি স্থান—ভারতের অন্তর্গত সিন্ধুদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, অযোধ্যা, আসাম, বঙ্গদেশ, বেরার, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে তিলের চাষ হয়।

চাষ প্রণালী—বৃষ্টি হইলে তিলের জমিতে একবার চাষ ও মই দিয়া দুই চারিদিন পরে আবার চাষ ও দুইবার মই দিতে হয়। পুনরায় আবার দুইটি চাষ ও মই দিয়া মাটি বেশ গুঁড়া হইলে বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ গোবর সার দিয়া জমিতে রস থাকিতে থাকিতে তিল বপন করিতে হয়। তিলের জমি বেশ উচ্চ হওয়া আবশ্যক। পলিযুক্ত জমিতে বা পাথুরিয়া জমিতে তিল বেশ ভাল হয়। তিলের জমির মাটিতে চুণ প্রভৃতি থাকিলে তিল বেশ ভাল হয়। মাঘ মাস তিল বুনিবার প্রকৃত সময়। তিল বিঘা প্রতি দেড় সের কিম্বা দুই সের আবশ্যক করে। যখন চারাগুলি ৪।৫ ইঞ্চি বড় হয়, তখন জমিটি একবার ছোট কোদাল বা চাঁচনী দ্বারা নিড়াইয়া দিতে হয়। যদি চারা ঘন থাকে তবে উহা উপড়াইয়া দেওয়া উচিত। প্রথম নিড়ানীর পর

১০।১২ দিন পরে আবার একবার নিড়ান দিতে হয়। তিলের জমিতে আর কোন পাইট করিবার দরকার করে না। চৈত্র মাস তিল কাটিবার সময়। তিলগুলি কাটিয়া একত্রে গাদা দিয়া ৪।৫ দিন রাখিতে হয়, এবং লাঠি দ্বারা ঠেঙ্গাইয়া লইলে তিল পাওয়া যায়। এক বিঘা জমিতে ৩।৪ মণ তিল জন্মে।

আউশ তিল বা কৃষ্ণতিল আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে বপন করিতে হয়, এবং জানুয়ারী মাসে পাকিয়া থাকে। আউশ তিলের সহিত কলাই অথবা তুলা বীজ মিশ্রিত করিলে উভয় ফসলই এক জমিতে পাওয়া যায়। তিলের জমিতে চাষ ও মাটি প্রস্তুত করিবার প্রণালী—আমন তিলের ন্যায়। ঢাকা জেলায় মাঘ মাসের মধ্যভাগে বিঘা প্রতি দেড় সের হিসাবে তিল ও দশসের পরিমাণে আমন ধান্য একসঙ্গে বুনিয়া থাকে। তিলগুলি চৈত্র মাসে কাটিয়া লইলে আমন ধান্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ জমিতে বিঘা প্রতি ৩/ মণ তিল হয়। মেদিনীপুর জেলায় চারি প্রকার তিল জন্মে। ইহার মধ্যে কাল ও সাদা তিল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বপন করে। পৌষ মাসে পাকিয়া থাকে। খাষলা নামক তিল ফাল্গুন-চৈত্রে আকের জমিতে বোনে; জ্যৈষ্ঠ মাসে কাটে। ভাদু তিল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বোনে, ভাদ্র মাসে কাটে। হুগলী জেলায় কাল তিল আষাঢ়ে বোনা হয়; আশ্বিনে কাটে। কাল তিল পৌষ মাসে বোনে, আষাঢ় মাসে কাটে।

ফরিদপুর জেলায় নিম্ন ভূমিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে তিল বপন করে এবং ভাদ্র মাসে কাটে। কালো তিল মাঘ-ফাল্গুনে বোনে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে কাটে। রংপুর জেলায় দুই জাতীয় তিলের চাষ হয়, যথা কৃষ্ণ তিল ও রক্ত তিল। কৃষ্ণ তিল ভাদ্র-আশ্বিনে বোনে, পৌষ মাসে পাকে। ইহা উঁচু জমিতে ভাল হয়। রংপুর এই তিল ঠিকরী কলাইএর সঙ্গে বুনিয়া থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন সময়ে তিল বোনে ও কাটে অর্থাৎ তিল বারমাস হয়।

তৈল—তিলের তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে, তিল ঝাড়িয়া ধুলা ও গুঁড়া পরিষ্কার করিতে হয়। পরিষ্কৃত তিল ঘানিতে ভাঙ্গিলে তৈল হয়। তৈল ভারতবর্ষ হইতে বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়।

খইল—তিলের খইল গরুতে খাইলে উহার দুধ বৃদ্ধি হয়। অন্য খইল অপেক্ষা তিলের খইল গরুতে ভাল খায়।

তৈলেরব্যবহার—তিলের তৈল ছবি আঁকিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা সাবান প্রস্তুত, শরীরে মালিশ, ও জ্বালানের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাদামের তৈল ও ঘৃতের সহিতও তিল তৈল ভেজাল দেয়। বিদেশ হইতে যে অলিভ অয়েল (চনিকধর তৈল) আমদানী হয় তাহাতে তিল তৈল মিশ্রিত থাকে। তিল তৈল হইতে অনেক সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়, এই তৈলের সহিত গোলাপ, বেল, বকুল, প্রভৃতি পুষ্প মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তিল বাটিয়া আঠার মত করিয়া মাখম মিশাইয়া অর্শস্থানে দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়। তিলের তৈল বাতরোগে উপকারী। তিল তৈলে মস্তিষ্ক শীতল রাখে। বাটা তিল দগ্ধ স্থানে ও টাকে দিলে ভাল হয়। প্রাতঃকালে তিলের ফুল হইতে শিশির বা জল খাইলে বা চক্ষে দিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়। পাতার রস ৬।৭ দিন খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। তিল চূর্ণ ১০ গ্রেণ প্রত্যহ ২।৪ বার ব্যবহার করিলে বাধক রোগ আরাম হয়।

সরিষা (Brassicasp)

সাধারণ বিবরণ—ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশে, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বোম্বে, মধ্যভারত ও ব্রহ্মদেশে প্রায় ১০ লক্ষ বিঘা জমিতে সরিষার চাষ হয়।

শ্রেণীবিভাগ—সরিষাকে সাধারণতঃ ২ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

১। ঊর্দ্ধ শুঁটীযুক্ত (নাতুয়া)

২। নিম্ন শুঁটীযুক্ত (উল্‌টী)

এই দুই প্রকার সরিষা আবার শতাধিক প্রকারের আছে। কাহারো শুঁটিতে দুই সারি সরিষা, কাহারো

শুঁটিতে চারি সারি সরিষা থাকে। নিম্নে প্রধান প্রধান গুলির নাম দেওয়া হইল :—

নাম	উৎপত্তি স্থান	পরিচয়
১। ভাটিসরিষা	মুর্শিদাবাদ	উৰ্দ্ধশুঁটি, ৪ সারি বীজ
২। টেপা	সিংহভূম, বৰ্দ্ধমান	শ্বেতবর্ণ ও ধূসর-বর্ণ ২ সারি বীজ
৩। ধমা	ত্রিপুরা ও নোয়াখালী	শ্বেতবর্ণ, ২ সারি বীজ
৪। ঝাটী সরিষা বা শ্বেতী	বাঁকুড়া ও ছোটনাগপুর	বহু প্রশাখা বিশিষ্ট বীজ
৫। কাজলি বা কাল সরিষা	রংপুর, শিলিগুড়ি হুগলী, ২৪ পরগণা	বীজ ২ সারি রং কালো গাছ লম্বা ও ডালযুক্ত
৬। টোরী সরিয়া	রংপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা যশোহর, ফরিদপুর	গাছ ছোট ফল শীঘ্র হয়
৭। মেড়ি সরিষা	মেদিনীপুর	গাছ বড় হয়
৮। মগলাই	ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা	ঐ
৯। পাহাড়ী	সিকিম	কপি পাতার ন্যায় পাতা
১০। শাদারাই	মেদিনীপুর	সোম ৪ সারি বীজ
১১। তেড়া সরিয়া	সাঁওতাল পরগণা	শুঁটী উৰ্দ্ধমুখী ৪ সারি বীজ

ডাক্তার প্রেন্ সাহেবের মতে বঙ্গদেশীয় সরিষাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

১। রাইসরিষা (B. Juncea).

২। মধ্য বঙ্গদেশের শ্বেতী সরিষা; ইহার গাছগুলি বড় হয় এবং দেখিতে Turnip গাছের ন্যায়।

৩। টোরীসরিষার (B. Napus) চাষ সমগ্র বঙ্গদেশে হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও ৪ রকমের সরিষা আছে, তাহাদের পার্থক্য বিশেষ না থাকায় এস্থলে তাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইল না।

টোরী সরিষা—টোরী সরিষা ও ভারতীয় রেপ সরিষা বঙ্গদেশ ও বিহারের বহুস্থানে চাষ হইয়া থাকে। ইহা রাইসরিষার গাছ অপেক্ষা ছোট এবং ডাঁটার সহিত পাতা গুচ্ছবদ্ধ ভাবে বাহির হয়। সরিষাগুলি রাই অপেক্ষা আকারে বড়, খোসা বেশ মসৃণ নহে। টোরী সরিষার ও রেপ সরিষার বীজ আকারে সমান, কিন্তু বঙ্গদেশীয় রেপ্ সরিষার দানা শ্বেতবর্ণ। রেপ্ সরিষার দানা কখন কখন টোরী সরিষা অপেক্ষা বড় হয়। টোরী সরিষার মধ্যে কতকগুলি শীঘ্র এবং কতকগুলি দেরীতে জন্মে।

রাই সরিষা—এই সরিষা সমস্ত বঙ্গদেশে ও বিহারে উৎপন্ন হয়। ইহার পাতা ডাঁটার সহিত গুচ্ছভাবে থাকে না। ইহার দানা ধূসরবর্ণ ও ঈষৎ লাল, আকারে টোরী অথবা রেপ সরিষা অপেক্ষা ছোট। রাইসরিষা আবার তিন ভাগে

বিভক্ত। লম্বা গাছযুক্ত, দেরীতে উৎপন্ন জাতি এবং শীঘ্র উৎপন্ন জাতি। শেষোক্ত জাতি আবার দুইভাগে বিভক্ত যথা—বড় গাছযুক্ত,—এইগুলি ছোটনাগপুর চট্টগ্রামে উৎপন্ন হয় ; ছোট গাছযুক্ত,—এইগুলি উড়িষ্যাদেশে জন্মে।

শ্বেতী সরিষা—শ্বেতী সরিষা অথবা উড়িষ্যার গঙ্গাটেরিয়া বঙ্গদেশে ও বিহারের বহুস্থানে জন্মিয়া থাকে। ইহার ডাঁটার পাতা গুচ্ছাকারে থাকে না। উপরিভাগে গুচ্ছ গুচ্ছ অনেক ফুল হয় ও গাছগুলি বড় হয় বলিয়া টোরীসরিষা হইতে ভিন্ন করা যাইতে পারে। ইহার দানাগুলি শাদা হয় এবং ইহার মধ্যে যে জাতির বীজ ধূসর বর্ণ হয়, তাহা রাইসরিষা অপেক্ষা আকারে বড় এবং উপরের খোসা মসৃণ বলিয়া টোরীসরিষা হইতে ভিন্ন করা যাইতে পারে। সরিষার ফলে দুই সারি বীজবিশিষ্ট সরিষা ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা দেশে জন্মে ; এবং চারি সারি বীজবিশিষ্ট সরিষা পশ্চিম বিহার ও বঙ্গদেশে জন্মে।

চাষ ও রোপণ-সময়—টোরীসরিসা এবং শ্বেতী সরিয়া মসূর, ছোলা, মটর ইত্যাদির সহিত বোনা যায়। কারণ ইহার গাছগুলি আকারে বড় হয়। সেজন্য মসূর, ছোলা, ও মটরের উপরিভাগে জন্মাইতে পারে। সরিষা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে বপন করিতে হয়। রাই সরিষা আরও কিছু পূর্ব্বে বোনা চলে। ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ্চ মাসে সরিষা পাকিয়া থাকে। সরিষা দেরীতে বুনিলে উহাতে

পোকা• ধরিবার সম্ভাবনা থাকে ; সেজন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে বোনা উচিত।

বীজের পরিমাণ—কলাইয়ের সঙ্গে সরিষা বুনিতে হইলে এক বিঘা জমিতে ⁄॥৹ সের বীজ লাগে। আর যদি জমিতে শুধু এই বীজ বুনিতে হয় তাহা হইলে এক বিঘা জমিতে ⁄১।৹ (পাঁচ পোয়া) বীজ লাগে। শুধু সরিষার চাষ করিলে এক বিঘা জমিতে ৫।৭ মণ সরিষার ফলন হয়।

মিশ্রিত চাষ ও উৎপন্ন তৈল—মটর কলাইয়ের সহিত সরিষার চাষ করিলে মটরের খুব ভাল ফলন হয়। কারণ মটর গাছ লম্বা রাই গাছে উঠিয়া ফলন বৃদ্ধি করে। রাই সরিষার তৈল শ্বেতী সরিষা অপেক্ষা পরিমাণে কম হয়। একমণ রাই সরিষার দশ সের তৈল হয়, একমণ শ্বেতী সরিষায় ১৩।১৪ সের তৈল পাওয়া যায়।

পোকার প্রতিকার—১। (Athalia Proximekl) কালমেড়ী নামে এক প্রকার পোকা আছে। এই পোকাগুলি শীতকালে অক্টোবর মাস হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত জমিতে প্রভাব বিস্তার করে। বিহার, পূর্ণিয়া, সাহাদাবাদ এবং ভাগলপুরে এই পোকা অত্যন্ত বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। চুণের গুঁড়া গাছে ছড়াইয়া দিলে অথবা রাস্তার ধুলার সহিত কেরোসিন তৈল মিশাইয়া গাছে দিলে উপকার হয়।

২। জাবপোকা—(Aphisbrossico Lirn) নিম্নবঙ্গে ও বিহারে এই পোকা গাছের পাতা, ফুল ও সরিষার শুঁটী

খাইয়া ফেলে; ইহাতে সরিষা গাছে কিছুই ফলন হয় না; কেবল গাছের ডাঁটাগুলি থাকে। ইহাতে (Crude oil emulsion) ছিটাইয়া দিলে উপকার হয়।

৩। মেরী পোকা—(Crocidolomia pinotalis, Tell) এই পোকাগুলি গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া তাহার মধ্যে বাস করে ও পাতা খাইয়া ফেলে। সরিষার ফুল ও শুঁটী ধরিতে আরম্ভ করিলে এই পোকাগুলি ফুল ও শুঁটীর রস খাইয়া শস্যের বিশেষ ক্ষতি করে। এই পোকার বিশেষ কোন প্রতিকার নাই; Kerosene emulsion একমাত্র ঔষধ।

৪। Pohydesmus Exitliosus, Kouhu—এই পোকা রাই গাছে ধরিলে পাতায় কাল দাগ ধরে এবং পরে এইগুলি বড় বড় আকার ধারণ করে। ইহাকে বঙ্গদেশে রাই পোকা বলে। এই পোকা কপি ও মূলা প্রভৃতি গাছে ধরিয়া থাকে। যখন গাছে পোকা ধরে তখন বোর্দো মিক্শচার দিতে হয়। এই ঔষধ আবার কপি ও মূলাতে দেওয়া যাইতে পারে না।

তিসি বা মসিনা

তিসি অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা আইন আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থেও তিসির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে ইহা

হইতে 'সূতা হইত। বর্ত্তমানে তিসি হইতে তৈল প্রস্তুত হইতেছে এবং সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট সূতার জন্যও তিসির চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জাতি—সাধারণতঃ শ্বেত ও ধূসর বর্ণের তিসি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত তিসি হইতে তৈল বেশী পরিমাণ হয়। ভারতবর্ষে প্রায় ১০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিসির চাষ হয়। তাহার মধ্যে বাংলায়, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, নোয়াখালী, বরিশাল ও ময়মনসিংহ জেলায় তিসির চাষ হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা—দোয়াশ মাটিতে তিসি ভাল হয়। শুধু বেলে মাটিতে ইহার চাষ ভাল হয় না। চূণের ভাগ বেশী থাকিলে ছোলা ও মসিনা একসঙ্গে বোনা চলিবে।

চাষ—বর্ষা কমিয়া গেলে ভাদ্রের শেষে আশ্বিনের প্রথমে ঘন ঘন চাষ দিয়া বিঘা প্রতি /২ দুই সের বীজ বপন করিবে। জমি আর্দ্র থাকিতে থাকিতে বীজ বপন করা উচিত। নীচু আমনের জমিতে ধান কাটিয়া কাদার ভিতর ছিটাইয়া বোনা চলে। তিসির ফুলে বৃষ্টি পাইলে বড় ক্ষতি হয়।

ফসলের সময়—ফাল্গুন ও চৈত্রে তিসি পাকে। যখন ইহাদের নীচের পাতা ঝরিয়া যায় এবং গাছে ফুল থাকে না তখনই পাকিয়াছে বুঝিতে পারিবে। এক বিঘায় তিন চারি মণ পর্য্যন্ত তিসি হয়। গাছগুলি হইতে সূতা হয়।

তৈল—একমণ তিসি হইতে ।০ সের তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল ছাপার কালী, বার্ণিশ, নরম সাবান ইত্যাদি শিল্পে

লাগে। চেয়ার, টেবিল, জানালা, দরজা ইত্যাদি রং করিতে এই তৈল ব্যবহার হয়।

চিনাবাদাম

চিনাবাদাম সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা মহাদেশে চাষ হইত। তথা হইতে পৃথিবীর অপরাপর স্থানে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। সম্ভবতঃ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বাদাম চিনদেশ হইতে এই দেশে আসে বলিয়া ইহকে চিনাবাদাম বলে। মাদ্রাজ প্রদেশে ইহার চাষ অধিক পরিমাণে হয়, বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে কর্ণাট, সোনাপুর, সেতারা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর চিনাবাদাম হয়।

মৃত্তিকা—চিনাবাদাম শুষ্ক বালুকাময় স্থানে বেশ ভাল উৎপন্ন হয়। দোআঁশলা এঁটেল মাটিতে কম হয়, এঁটেল মাটিতে কম হইলেও কখন তোলা যায় না।

বপন সময়—আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ব্যতীত সকল সময়ই বপন করা যায় এবং যখনই বপন করা যায় ৬ মাসে ফুলে শোভিত হয়, ৭ মাসেই মাটি খুড়িয়া চিনাবাদাম তোলা যায়।

চাষ ও বীজের পরিমাণ—বিঘা প্রতি ।০ দশ সের বীজ আবশ্যক হয়। বীজের উপরের খোসাটি আস্তে ভাঙ্গিয়া দিবে যেন বীজ-দানায় আঘাত না লাগে। এক ফুট দূরে দূরে বীজ বসাইবে। গাছ এক ফুট উঁচু হইলে আলুর ন্যায় পিলি বা ভেলী বাঁধিয়া দিবে।

সার—দোআঁশলা বেলে জমির পক্ষে একগাড়ী গোবর সার, একগাড়ী পচা পুকুরের বোঁদ মাটি ও একগাড়ী ছাই উৎকৃষ্ট সার। এই সার দিতে অক্ষম হইলে ঐ জমিতে ধঞ্চে বুনাইয়া গাছগুলি এক হাত উঁচু হইলে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জমি চষিয়া দিয়া বাদাম বপন করিবে। জল দেওয়া আবশ্যক হইলে আলুর জমির ন্যায় নালা কাটিয়া জল দিবে।

ফলন—এক বিঘা জমিতে ১৫/০ মণ চিনাবাদাম হইতে পারে। কম পক্ষে ৬৲ টাকা মণে দরে বিক্রয় হইলেও ৯০৲ টাকা; চাষের খরচ বিঘা প্রতি ৩০৲ ত্রিশ টাকার বেশী নয়; ৯০৲—৩০৲ বাদ দিলে ৬০৲ টাকা বিঘা প্রতি নেট্ আয় হয়; ইহা লাভজনক কৃষি।

বাদাম তৈল—চিনাবাদাম হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। এক মণ চিনাবাদামে প্রায় সতের সের তৈল হয়। এই তৈল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতায় অনেক খাবারের দোকানে এই তৈল দ্বারা লুচি ইত্যাদি ভাজা হয়। দুষ্ট ব্যবসায়ীরা নারিকেল তৈল ও ঘৃতের সহিত ইহার ভেজাল দেয়। এই তৈলে আলো জ্বালা যায়।

শিমূল আলু

শিমূল আলুর আদি জন্মস্থান আমেরিকা। ১৮৪০ অব্দে পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহা আনীত হয়। বর্ত্তমানে পণ্ডিচারী, দমন, দিউ ও গোয়া প্রভৃতি স্থানে প্রভূত

পরিমাণে ইহার চাষ হইতেছে। দুর্ভিক্ষে ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই আলু দুই রকম। ইংরাজী নাম কসাভা।

গাছের পরিচয়—কসাভা গাছ রেড়ী গাছের ন্যায় লম্বা, পাতা শিমূল গাছের পাতার ন্যায়। পাতার উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নীচের দিক ফিকে সবুজবর্ণ। একই ডাঁটায় স্ত্রী ও পুং পুষ্প জন্মিয়া থাকে। স্ত্রী পুষ্প অপেক্ষা পুং পুষ্প আকারে ক্ষুদ্র, এবং পুং পুষ্প স্ত্রী পুষ্পের উপরে থাকে। ফুলগুলির বহির্ভাগ গাঢ় লালবর্ণের আভাযুক্ত সবুজ, ভিতর সামান্য লালের আভাযুক্ত সবুজ। বীজগুলি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, গাছের মূল দেখিতে ধূসর ও লালের আভাযুক্ত। মূলের ভিতর শ্বেতবর্ণ। প্রায়ই ভারতে মিষ্ট কসাভা গাছের ফুল হয় না।

চাষ—এই গাছে জলের বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই গাছের ডাল ৭।৮ ইঞ্চি করিয়া কাটিয়া বেড়ার গায়ে পুঁতিয়া দিলে পরে বেড়ার কাজ করিবে। জমি গভীর ভাবে কোপাইয়া পরে চাষ দিয়া চারি হাত অন্তর ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা ডালগুলি একটু বাঁকা করিয়া বৈশাখ মাসে বৃষ্টির পর পুঁতিয়া দিবে এবং প্রতি ২ মাস অন্তর গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া খুঁচিয়া দিবে। শীতের শেষ হইতে লাগান চলিবে। এই কসাভাকে পূর্ব্ববঙ্গে শিমূল আলু, মেদিনীপুরে সকরকন্দ আলু বলে। গাছগুলি ৪ ফুট হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। প্রতি গাছে ৪।৫ সের হইতে অর্দ্ধ মণ পর্য্যন্ত আলু বা মূল হয়। ইহা হইতে ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই গাছ বাংলার সর্ব্বত্র

উঁচু জমিতে হইতে পারে। মিষ্ট জাতীয় গাছ লাগান ভাল, তবে গরম জলে সিদ্ধ করিলে সামান্য তিক্ততা চলিয়া যায়। এক বিঘা জমিতে কসাভা গাছ লাগাইতে হইলে। ৬০০ শা ডগা (cutting) লাগাইতে হইবে। ১৫০ হইতে ২০০ মণ মূল বা আলু পাওয়া যাইবে। তাহার দাম অন্ততঃ ২০০ টাকা বিঘা প্রতি আয় হইবে। খরচ খুব বেশী হইলেও বি প্রতি ৫০৲ টাকা লাগিবে।

ময়দা প্রস্তুত করণ—মূলগুলি মাটি হইতে তুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ধারাল ছুরি দ্বারা কাটিয়া, টুকরা টুক করিয়া ১ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া মণ্ড তৈয়ারী হইলে কাপড়ে বাঁধিয়া ছানার জল ফেলার ন্যায় ভা জিনিষ চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। তাহাতে তিক্ত ও বিষা পদার্থ বাহির হইয়া যাইবে। পরে উক্ত মণ্ড শীতল জ গুলিয়া, কিছু সময় পরে ধীরে ধীরে উপরের জল ঢালিয়া ফেলিবে। নিচের দ্রবময় পদার্থ শুকাইলে ময়দা হইবে। গমের ময়দা সহ মিশাইয়া আটার রুটির ন্যায় রুটি, লুচি হালু ইত্যাদি প্রস্তুত হইবে।

৮০